অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী সিদ্ধানন্দ
কর্তৃক সঙ্কলিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় প্রকাশ
১৯৮৫-১৯৮৬

দশম পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২০
February 2014
1M1C

ISBN 81-8040-300-9

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

নিবেদন

শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় 'অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ' বাহির হইল। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের পুণ্য জীবন-কথা ও বাণীর অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বাকী যাহা আমাদের নিকটে ছিল তাহা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল।

'অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ' প্রকাশ করা আমার একক প্রচেষ্টায় সম্ভব ছিল না। অনেকের নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, বিশেষ করিয়া নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়কে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রাচীন ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন পরিশিষ্টে লাটু মহারাজের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতি লিখিয়া এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নিকটও আমি ঋণী।

এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ আয় উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় নিয়োজিত হইবে।

কলিকাতা, সিদ্ধানন্দ

৺মহালয়া, ১৩৬৪

লাটু মহারাজ

(সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বা লাটু মহারাজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের ভাষায় লাটু মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের **miracie** বা যোগবিভূতি। বর্ণ বা বংশের কোন ছাপ তাঁহার ছিল না। প্রচলিত অর্থে বিদ্যাশিক্ষাও তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি উত্তর কালে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মসংস্কার শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্যে বৈরাগ্য-তপস্যা-জ্ঞান-ভক্তি মণ্ডিত এমন একটি আধ্যাত্মিক চরিত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছিল যাহা সত্যই বিস্ময়কর। অক্ষর জ্ঞান না থাকিলেও শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ সত্যসমূহ তিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই উপলব্ধি সহজ সরল কথায় শত শত জিজ্ঞাসুকে কী সুন্দর বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার কথার মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকিত যাহা দুর্বল হৃদয়কে সবল করিয়া দিত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় পীড়িত ও অস্থির প্রাণে অতীন্দ্রিয় শান্তি আনয়ন করিত। লাটু মহারাজের কোন মন্ত্রশিষ্য ছিল না—কিন্তু শত শত লোক এই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের পুণ্য সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভ

করিয়া ধন্য হইয়াছেন, হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও পূজা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন।

লাটু মহারাজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ছাপরা জেলার এক দরিদ্র মেষপালকের গৃহে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। শৈশবের নাম ছিল রাখতুরাম। বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু ঘটে। এক নিঃসন্তান খুল্লতাত বালকের প্রতিপালনের ভার নেন। কৈশোরের শেষে ইহারই সহিত রাখতুরাম কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে বালক ভৃত্য নিযুক্ত হন। এই কাজই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপনের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল। রামবাবু মধ্যে মধ্যে রাখতুরামকে দিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট ফল মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝিলেন ঐ বালক ভৃত্যের ভিতর ভবিষ্যতে সার্থক ধর্মজীবনের পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

রাখতুরামের কর্মঠ অমায়িক স্বভাবের জন্য রামবাবু এবং তাঁহার গৃহের সকলেই তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন এবং আদর করিয়া ডাকিতেন লাল্টু (রাখতুর অপভ্রংশ)। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় নিবিড়তর হইতে থাকিলে তিনিও বালককে উত্তরোত্তর স্নেহ করিতেন এবং শ্রীভগবানে

ভক্তি প্রেম লাভ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ লাটুর পক্ষে আর চাকরি করা বিস্বাদ মনে হইতে লাগিল। সারা মন দক্ষিণেশ্বরে পড়িয়া থাকিত, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া যাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিতেন। ভক্ত রামচন্দ্র পরম প্রিয় শ্রীগুরুর প্রতি বালক ভৃত্যের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া পুলকিত হইতেন।

ভাগিনেয় হৃদয়কে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ত্যাগ করিতে হইলে ঠাকুরের ব্যক্তিগত সেবার বড় অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তিনি একদিন রামচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ রাম, এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসত্ত্ব, আর এখানে থাকতেও ভালবাসে।" রামচন্দ্র সানন্দে সম্মত হইলেন। লালটু অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকরূপে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, আদর করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন 'লাটু' কখনও বা 'লেটো' বা 'নেটো'। লিখিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহাকে বর্ণপরিচয় পড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর 'ক' বর্ণ দেখাইয়া লাটুকে বলিলেন, বল্ 'ক'। লাটুর জিহ্বায় অকার আসে না। তিনি উচ্চারণ করেন 'কা', ঠাকুর যতই বলেন, 'কা' নয় 'ক' লাটু ততই 'কা' 'কা' করিতে থাকেন। ঠাকুর তখন হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা আর তোর পড়ে দরকার নেই।" লৌকিক বিদ্যাশিক্ষা এখানেই শেষ হইল, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার পাঠ চলিতে

লাগিল। ইতিমধ্যে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ যুবক পার্ষদরা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সহিত লাটু দিন দিন ঠাকুরের অপার্থিব স্নেহচ্ছায়ায় অধ্যাত্মমার্গের সোপান-গুলি ক্রমান্বয়ে আরোহণ করিয়া চলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অপর ভক্তদের নিকট তাঁহার বৈরাগ্য ধ্যানতন্ময়তা ভাবভক্তি বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি যুবক ভক্তরাও লাটুকে নিজেদেরই একজন বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের পরস্পরের সৌভ্রাত্র ও মিত্রতা ছিল অতুলনীয়। সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে লাটু প্রাণপণে নররূপী ভগবানের সেবায় তৎপর থাকিতেন। ঠাকুর কলিকাতায় গেলে লাটু প্রায়ই সঙ্গে যাইতেন।

একদিন লাটু ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাবেলা ঘুমাইতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জাগাইয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, এই ভর-সন্ধ্যাবেলায় ঘুম কিরে? এত ঘুমুলে ভগবানকে ডাকবি কখন? তদবধি লাটু মহারাজ সারাজীবনের জন্য রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ দুরারোগ্য গলক্ষত রোগে পীড়িত হইয়া প্রথমে কলিকাতায় শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুর বাগান বাড়ীতে নীত হইলেন। ঠাকুরের রোগশয্যায় অন্যান্য ভক্তদের সহিত লাটু ছিলেন একজন অক্লান্ত একনিষ্ঠ সেবক। শ্রীশ্রীমাও

লাটুকে পুত্রবৎ স্নেহের চোখে দেখিতেন। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা জননী লাটুর নিকট কোনই সঙ্কোচ করিতেন না।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর লাটু শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বৃন্দাবন ধামে কাটান। পরে বরাহনগর মঠে ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের সহিত মিলিত হন। তাঁহার বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রতা ও সাধনানুরাগ গুরুভ্রাতৃগণকে মুগ্ধ করিত। পরিব্রজ্যার দিকে তাঁহার বিশেষ মন ছিল না। একস্থানে পড়িয়া থাকিয়া ভগবৎচিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকাই ছিল তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

বরাহনগর হইতে মঠ যখন আলমবাজারে উঠিয়া যায় লাটু মহারাজ তখন তথায় বিশেষ বাস করেন নাই। বেশীর ভাগ গঙ্গাতীরেই পড়িয়া থাকিতেন। কোন সহৃদয় গৃহস্থ ভক্তের নিকট কখনও দুচার পয়সা লইয়া কিছু ছোলাভাজা বা চালভাজা কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; দেহযাত্রার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখ গে। জগতের কাহারও সহিত বাধ্যবাধকতা নাই। সম্পূর্ণ নির্মায়িক, আত্মারাম পরমহংস।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ফিরিয়া মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণকে তিনি লোকসেবায় আত্মত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন; কিন্তু লাটুকে ঐ কাজে নামাইতে পারিলেন না। লাটু তাঁহার

চিরাচরিত সাধন ভজনের জীবন লইয়াই থাকিলেন। স্বামীজীও তাঁহার মনোগত ভাবকে জোর করিয়া ব্যাঘাত করিলেন না। কেননা তিনি জানিতেন লাটু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কত স্নেহ ও কৃপা পাইয়াছেন। লাটুর প্রতি স্বামীজীর গভীর প্রীতি ছিল। লাটুও স্বামীজীকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর লাটু মহারাজ অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগ যদিও তিনি নিজে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি পরবর্তীকালে মঠে আগত যুবক ব্রহ্মচারী ও সাধুদের বারবার স্বামীজীর আদর্শ গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিতেন। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সীমা ছিল না।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুকাল আগে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ গৃহীভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাগবাজার রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ গৃহে থাকিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বহু পুণ্যস্মৃতি জড়িত ঐ বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। লাটু মহারাজ খ্রীঃ ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ এখানেই বাস করিয়াছিলেন। ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁহার সমান ব্যবহার ও সহানুভূতি অপূর্ব শিক্ষার বিষয় ছিল। আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি-বলে তিনি মানুষের মন বুঝিতে পারিতেন। এবং দু একটি

কথায় দ্বন্দ্ব ও সংশয় দূর করিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও নির্ভরতা ছিল অপরিসীম। একদা দক্ষিণেশ্বরে যে বালক ঠাকুরের নির্দেশে নহবত ঘরে অবস্থিতা লজ্জাবগুণ্ঠিতা জননীর গৃহকাজে সাহায্য করিতেন, পরিণত বয়সে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর মধ্যে সেই বালক সর্বদা 'মা' 'মা' বলিয়া জাগিয়া থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা গ্রন্থ হইতে নিম্নের উদ্ধৃতিটি শ্রীশ্রীমা ও লাটু মহারাজের গভীর স্নেহসম্বন্ধের স্বচ্ছ পরিচয় বহন করে।

"১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৺দুর্গা পূজার সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আসিয়া বলরাম মন্দিরে এক মাস ছিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি লাটুকে দেখিয়াই বলিলেন, বাবা লাটু, কেমন আছ? লাটু অমনি উত্তর দিলেন, তুমি ভদ্দর ঘরের মেয়ে, সদর বাড়ীতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ? আমাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতে।

"খেয়ালী সন্তানের ভব্যতা দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন। কখন কখন অদ্ভুতানন্দ মায়ের সম্বন্ধে বেদান্ত বিচার করিতেন। মা জয়রামবাটী ফিরিবেন। লাটু মনের বিষাদ ঢাকিবার জন্যই বোধহয় নিজের ঘরে দ্রুত পদচারণা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বেদান্ত বিচার করিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসীর কে পিতা, কে মাতা? সন্ন্যাসী নির্মায়া। মাতাঠাকুরাণী নীচে নামিয়া উহা শুনিলেন এবং দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বলিলেন, 'বাবা লাটু, তোমায় আমাকে

মেনে কাজ নেই বাবা।' আর যায় কোথায়? স্নেহের স্পর্শে বেদান্ত ভাসিয়া গেল—লাটু মায়ের পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মাও তখন অশ্রুসিক্তা। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া লাটু আবার তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাঁদতে কি আছে? ইহা বলিয়া স্বীয় উত্তরীয়ে মায়ের অশ্রুমোচন করিলেন। মায়ের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ একদিন অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'মাকে মানা কি সহজ কথা রে? তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী'।"

১৯১২ সালে লাটু মহারাজ কাশীতে চলিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর কাশীর বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া পরে ৯৬নং হাড়ার-বাগের ভাড়া-বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং মহাসমাধি পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করেন। যে ধ্যান তপস্যা এ যাবৎ তাঁহার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কাশীতেও তা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। আহার বিহারের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সর্বদাই একটা অতীন্দ্রিয় ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা তাঁহার মুখে বড় শুনা যাইত না। ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার উপর প্রগাঢ় ভক্তি প্রতি আচরণে ও কথায় প্রকাশ পাইত। ৺কাশীতে সাধু ও ভক্তেরা তাঁহার পুণ্য সঙ্গ লাভে ধন্য হইতেন। তিনিও

সহজ সরল ভাষায় আধ্যাত্মিক জীবনে নানা প্রসঙ্গ ও কার্যকরী নির্দেশ দান করিয়া সকলকে তৃপ্তি দিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বহু লোক ধর্মসাধনার পথে প্রভূত আলোক ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ লাটু মহারাজের জ্ঞান-বৈরাগ্যময় উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

শেষ বয়সে তাঁহার দেহে বহুমূত্র রোগ দেখা দিয়াছিল। উহার ফলে কয়েকটি বিষাক্ত ক্ষত হয় এবং উহাতেই তিনি দেহত্যাগ করেন (১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল)। তাঁহার পূতদেহ মণিকর্ণিকায় জলসমাধি দেওয়া হয়। গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজী (হরি মহারাজ) তাঁহার শেষ শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। লাটু মহারাজের দেহত্যাগের পর তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন "যাহারা চরমকালে লাটু মহারাজের পরমানন্দ মূর্তি দেখিয়াছে তাহাদের সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ।"

স্বামী সিদ্ধানন্দ কাশীতে দীর্ঘকাল পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে লাটু মহারাজ যে সকল ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদবলম্বনে লাটু মহারাজের বহু উপদেশ 'সৎকথা'

(উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (ইনিও পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করিয়াছিলেন) লাটু মহারাজের 'স্মৃতিকথা' নামক পুস্তকে (উদ্বোধন কার্যালয়) এই মহাপুরুষের জীবনী ও অনেক প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ১ম ভাগেও (উদ্বোধন কার্যালয়) লাটু মহারাজের জীবন কথা গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে।

স্বামী সিদ্ধানন্দর ডায়েরী হইতে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের আরও কিছু উপদেশ সঙ্কলিত হইয়া বর্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করা হইল। এই উপদেশগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে মাসিক বসুমতী ও উদ্বোধনে পূর্বে ছাপা হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উপদেশাবলী

ঈশ্বর

ভগবান এমন জায়গায় আছেন যেখানে মত, পথ, শাস্ত্রনিয়ম, আচার-বিধি কিছুই পৌঁছুতে পারে না।

ভাগ্য-বল, পুণ্য-বল, ঐশ্বর্য-বল সবই ভগবান থেকে আসছে। ভগবানকে চাইলে সবই পাবে। যাঁরা ভগবান লাভ করেছেন তাঁরা এ সব কিছুই চান না; তাঁদের কাছে এ সব তুচ্ছ। তাঁরা সবার বড় জিনিসের স্বাদ পেয়ে বসে থাকেন। তাঁদের ছুটাছুটি, হুটাপুটি সমস্তই বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা নিজেতেই নিজে ডুবে যান। যাঁরা ভক্ত, ঈশ্বর সর্বদাই তাঁদের পেছনে পেছনে থাকেন।

জগৎকে জানতে যেও না। জগৎকর্তাকে জানতে চেষ্টা কর। তাঁকে জানলে কিছুই অজানা থাকে না। তিনিই সব বুঝিয়ে দেন।

ভগবান আছেন এটি অন্ধ বিশ্বাসেই অনুভব করা যায়। আর চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়।

ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না কেন? আমাদের ভেতরে বহু গলদ আছে এই জন্য। যে ঠিক-ঠিক তাঁকে চায় ও তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধন করে, তার ওপর তাঁর কৃপা হয়। তিনি শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত হন। সাধন না

করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সাধন-ভজন, জপ-তপস্যা সমস্তই চিত্তশুদ্ধির জন্য। ভগবান খাঁটি; অন্তর খাঁটি না হলে তিনি প্রকাশিত হন না। খাঁটি না হ'লে ভগবানের মহিমা বা ভাব বুঝবে কি করে?

ভগবানকে মানো আর না মানো, তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না বা তিনি তাতে রুষ্ট হন না। যে মানে তার আত্মা শান্তিতে থাকে এবং জীবাত্মার ভয় দূর হয়। তিনি ছাড়া জীবকে কেউ অভয় দিতে পারেন না।

মন পবিত্র হলেই ঈশ্বর কি বস্তু তা কিছু অনুভব হয়। ঠাকুরের মতে ভগবান শুদ্ধ মনের গোচর।

মূলকে ধরে থাক। তিনিই সব করাচ্ছেন। ইষ্টই হচ্ছেন সেই মূল। তিনিই পরম গুরু—ভগবান। শ্রীগুরু সেই মূলকে ধরিয়ে দেন।

ভগবান অন্তর্যামী। তাঁকে অন্তর থেকে প্রাণ ভরে ডাকতে হয়। তবে তাঁর কৃপা হয় ও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। বাইরের ভেক নিলেই হয় না। ভগবান খাঁটি; অন্তর খাঁটি না হলে তাঁকে লাভ করা যায় না। মনের গলদ যতই ধুয়ে মুছে যাবে, তাঁর কৃপা ততই প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে।

ভগবানকে কেউ 'অধর' বলে থাকে, কথাটা ঠিক। তিনি দয়া করে ধরা না দিলে কেউ কি তাঁকে ধরতে বা চিনতে পারে? ত্যাগী ভক্তের নিকট তিনি আপনি এসে

ধরা দেন। এমনি ত্যাগের আদর ও মহিমা। ভগবান ভক্তি-ডোরে বাঁধা। এই জন্যেই তো বলে—ভক্তের ভগবান। ভক্তের শুদ্ধ চিত্তে তিনি নিজে নিজেই প্রকাশিত হন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। যার ত্যাগ নেই, সংযম নেই, সাধন-ভজন নেই—এমন সাধন-সম্বল-হীন লোক কী ভেট্ নিয়ে সেই রাজরাজেশ্বরের দরবারে পৌঁছবে ?

ভগবানকে ঠিক ঠিক চাইলে তিনিই তাঁকে পাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেন। সাধকের যখন যা দরকার, তিনি সব জুটিয়ে দেন। তাঁকে ধরে থাকলে সাধুসঙ্গ, কৃপা—এ সবই হবে। তবে তিনি বাজিয়ে নেন, মেকি হলে চলবে না। ঠিক ঠিক অনুরাগ হয়েছে কি না তিনি দেখে নেন।

ভগবান জীবকে দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে তাঁরই দিকে নিয়ে চলেছেন—জীব বুঝুক আর না বুঝুক। ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্ষুদ্র মানুষ বুঝবে কি করে ? যাঁরা ঠিক ঠিক সাধু তাঁরাই তাঁর মহিমা জানেন। এই জন্যই তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে বসে থাকেন।

তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলা করছেন। তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময়, দয়াময়—তিনি সবই। তাঁর নাম অনন্ত, তাঁর লীলা অনন্ত, তাঁর ভাবও অনন্ত। তিনি অনন্ত ভাবময়। সামান্য জীব তাঁর অনন্ত ব্যাপারের কতটুকু বুঝবে ?

ভগবানের শরণ নিয়ে থাক। তাঁর চরণে একান্ত

নির্ভর করে পড়ে থাকলে তবেই তিনি এই মায়ার হাত থেকে ত্রাণ করেন। নইলে কিছুতেই বাঁচোয়া নেই; সকলকেই বিষম নাকানি-চোপানি খেতে হয়। তাঁর শরণাগত হও। তাঁর চরণে নিজেকে বিকিয়ে দাও। 'আমি' বা 'অহং' ভাব থাকলে তাঁর দরজা খোলে না। 'আমি' মরলে তিনি হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন।

ব্রহ্মচর্য ও সংযম

কায়মনোবাক্যে যদি ব্রহ্মচারী হতে পারিস্ তবে ভগবানকে জানতে বেশী দেরী হবে না। ব্রহ্মচর্য মানে পূর্ণ শুদ্ধ ভাব; রিপুর উত্তেজনাকে নষ্ট করে দিয়ে মহা পবিত্র হওয়া। তাহ'লে অল্প সাধন-ভজন করলেই অনুরাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। কিছু দিন করেই ছাখ, একবার পবিত্র ভাব হলে অপবিত্র ভাব সহ্য হবে না। তখন সদানন্দে বিভোর থাকবি। অপবিত্র ভাবই নরক, দুঃখ ও পাপ। ঠাকুর বলতেন—বিষ্ঠার মধ্যে থেকে থেকে লোক পবিত্রতার মর্ম কি করে বুঝবে? অপবিত্রতাই বিষ্ঠা।

সংযমী না হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হয় না। সংযমের দ্বারা মন শুদ্ধ ও পবিত্র হলে বুদ্ধি নির্মল হয়। তখন অল্প সাধনেই সব বিষয় ঠিক ঠিক বুঝা যায়। সৎচিন্তায় মন সংযত হয়। সৎকে ধরে থাকতে হয়, না হ'লে বুদ্ধিভ্রষ্ট

হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় এবং তাঁকে জানা যায়।

আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলছি, তোমরা যদি আমার কথা শুনে চল, কল্যাণ হবে। সংসারে থেকে তোমরা যখন ব্রহ্মচর্য পালন করছ, তোমরা ভীষ্মদেব, লক্ষ্মণ আর মহাবীরকে সামনে রেখে চলবে ও এঁদের জীবন আলোচনা করবে। তোমরা স্বামীজীর জীবন তো প্রত্যক্ষই দেখলে। তাঁর জীবন ও উপদেশ হতে শিক্ষা লাভ করবে। সাবধান! যেন বৈষ্ণবদের মত মধুর ভাবের সাধনা করতে যেও না, তাহলেই সব ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যাবে! এ যুগে মাতৃভাব আমাদের ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁর নিজের জীবন দ্বারা দেখিয়ে গেলেন। মাতৃভাবের মত শুদ্ধ ভাব আর নাই। যাঁরা নারী মাত্রকেই মাতৃজ্ঞান করেন, তাঁরাই যথার্থ ব্রহ্মচারী। ও-সবে (মধুর ভাবে) আসল উদ্দেশ্য প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। এ জন্যই তোমাদের বলছি, ঐ সব মহাপুরুষদের পবিত্র জীবন স্মরণ করে এগিয়ে যাও। তাঁদের স্মরণ করলে হৃদয় পবিত্র ভাবে ভরে উঠবে আর ভিতরে বল (শক্তি) ও উৎসাহ পাবে। সাধন-পথে অনেক বিঘ্ন হতে তাঁরা তোমাদের বাঁচিয়ে দেবেন। তাই বলছি, যদি বাঁচতে চাও তবে ঐ সব কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগীদের জীবন দেখ আর তাঁদের উপদেশ মেনে চলতে থাক। তাতে তোমাদের নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে। আর

তোমরা শুকদেব, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দ এঁদের নাম নিত্য স্মরণ করবে।

যে কোনও মুহূর্তে মানুষ পশুর চেয়েও হীন হয়ে যেতে পারে। মন নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই বুঝতে পারবে। যারা খুবই সংযমী তারাই পতন হতে বেঁচে যায়।

চরিত্রের জোর না থাকলে ধর্ম বা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বোঝা যায় না। লোকে শাস্ত্র-পুরাণের ওপর কত গাল-মন্দ করে। সংযমী হ'লে তবে শাস্ত্রের বাক্য সত্য বলে উপলব্ধি হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" অর্থাৎ, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন একমাত্র সংযমী চিত্তই জাগ্রত থাকে।

ভগবানকে পেতে হলে যেমন করেই হোক ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। বীর্য ধারণ না করলে দেহ-মন কিছুতেই শুদ্ধ হতে পারে না। নিত্যশুদ্ধ ভগবানকে ধারণা করবে কি করে? সংযমী না হলে মানুষের কোনো সদ্-বৃত্তিরই বিকাশ হয় না। সে পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কোনো বড় কাজ তার দ্বারা হতে পারে না। এখনি এক কথা বলছে কিন্তু পর-মুহূর্তেই লোভে পড়ে অন্য কাজ করছে। যে ব্যক্তি সৎ হবে তার ব্রহ্মচর্য থাকা চাই-ই—অন্য কিছু থাক আর না থাক্। রিপুকে জয় না করতে পারলে কিছুই হবার যো (উপায়) নেই।

সাধু হওয়া কি চারটি কথা? কতো প্রলোভন আসে

এবং সংস্কারে বাধা দেয়। সব অবস্থাতেই অবিচলিত থেকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও সংযম না থাকলে প্রলোভন প্রলুব্ধ করে সাধককে বাধা দেয়। ব্রহ্মচর্যের অভাব হলে সেই অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। জীবনে ব্রহ্মচর্য ও সংযম থাকলে সাধককে কোনো অবস্থাতেই তারা সহজে প্রলুব্ধ করতে পারে না।

ব্রহ্মচর্যই ধর্ম-সাধনার মূল। কায়মনোবাক্যে বীর্যবান হতে হবে। তবেই ধর্মের তত্ত্ব আপনা-আপনি প্রকাশিত হতে থাকবে। তখন সাধক বুঝতে পারবে ধর্ম কী জিনিস।

পবিত্র হও—পবিত্র হও। ভক্তের সংযম ও ব্রহ্মচর্য বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ ও নিয়মিত ধ্যান-জপে সংযম আসে।

পবিত্রতাই ব্রহ্মচর্যের ভিত্তি। শাস্ত্র বলেছেন—শৌচ অর্থাৎ অন্তরে-বাহিরে শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধ না হলে ধর্মের তেজ ও আনন্দ ধারণ করা যায় না। কলির জীবের ব্রহ্মচর্য নেই বলে ধর্মভাব বুঝতে পারে না। নইলে ধর্ম বুঝবার ও বোঝাবার জন্য এত মিটিং আর বক্তৃতার দরকার হত না। ধর্ম হচ্ছে স্বয়ংপ্রকাশ।

ভোগ-বাসনাকে গোড়া থেকেই দাবিয়ে দিতে হয়। রিপু-জনিত ভোগ-বাসনার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই

নেই। একটু সংযমের অভাব হ'লে এরা প্রশ্রয় পেয়ে অলক্ষ্যে প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং সাধককে সাধন-মার্গ হতে নামিয়ে দিতে চায়। তখন আবার সে অবস্থা ফিরে পেতে গেলে চার গুণ খাটতে হয়। সেই জন্ত কামভাব উঠবার আগেই তাকে বিবেক ও মনের জোরে নিরোধ করে দিতে হয়। তা হলে ক্রমে ক্রমে প্রবল শক্তি আসে এবং সাধকের বড় একটা পতনের ভয় থাকে না। ব্রহ্মচর্য বিষয়ে সাধকের সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত। তাই বলছি—সাধু সাবধান!

ব্রহ্মচর্য পালন করে সৎসঙ্গ কর্। তারপর যদি কিছু না বুঝতে পারিস্, তবে আমাকে বল্‌বি। সাধুসঙ্গ যে কী, তখন প্রাণে-প্রাণে বুঝতে পারবি এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবি। ব্রহ্মচর্য নেই, সংযম নেই, শুধু ঘুরে-ঘুরে আর সাধু-সন্ন্যাসীদের বকিয়ে কী হবে? যতই সাধুদের কাছে আসা-যাওয়া কর্ না কেন, ব্রহ্মচর্য ও সংযম জীবনে না থাকলে কিছুই হবার যো নেই।

সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ খুবই দরকার। সাধু কে? যিনি গুরু ও ইষ্টের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন—তাঁদের দিকে গতি করান।

সাধন-ভজন করলে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝা

যায়। তখন আর সংশয় থাকে না। দেবস্থানে ও সাধু-স্থানে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে হয়। তাহলে অনেক কাজ হয়।

যে যেমন করে পার সাধুসঙ্গ কর। ভগবান সাক্ষাৎ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁদের দয়া হলে ঈশ্বরের কৃপা হয়।

সাধুসঙ্গে কর্ম ক্ষয় হয়; সাধু-দর্শনে পুণ্যলাভ ও সাধু-সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়। সাধুসঙ্গে অনেক সময় খুব পতন থেকেও বাঁচা যায়। মন খুব চঞ্চল হলে সাধুসঙ্গ করতে হয়। তাঁদের সঙ্গ করলে দেহ ও মন শুদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভালবাসা জন্মে।

সাধুসঙ্গে ও তীর্থস্থানে বাস করলে কল্যাণ হয়। এগুলি সাধন-ভজনের বিশেষ অঙ্গ। ভগবান ভেতরে-বাইরে সব জায়গায়ই সাধনার স্থান করে রেখেছেন। যে সাধন করে সে টের পায়। সাধুসঙ্গ ধর্ম-জীবনে একান্তই আবশ্যক।

সাধুর কখনও সমালোচনা করতে নেই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। তাঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখলে নিজেরই মঙ্গল। সাধু না হলে সাধু চিনতে পারে না—সে যতই বড় লোক হোক না কেন। আর সাধু-সন্ন্যাসীদের বিচার করার সাধারণের স্পর্ধা থাকবেই বা কেন?

সৎসঙ্গের এমনি মহিমা যে, সামান্য কীটও ফুলের সদ্‌গুণে ভগবানের চরণে গিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি সাধুসঙ্গ-গুণে মানুষের ভগবান লাভ হয়ে যায়। ভগবান লাভ মানে কি? আনন্দ লাভ। ভগবান সচ্চিদানন্দ কি না!

তাঁকে লাভ করলে দুনিয়াতে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না—সব বিষয়ের সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়। সে আনন্দ পেলে জীব ভরপুর হয়ে যায়—আর তার কাছে যে আসে সেও সেই আনন্দের স্বাদ পায়। তখন তার শোক-তাপ সমস্ত দূর হয়ে যায়। নিজের কোন পুঁজি না থাকলে কি কেউ অপরকে আনন্দ দিতে পারে। নিজেই যে আনন্দের ভিখারী, সে আবার অপরকে আনন্দ দেবে কি? সাধুসঙ্গে শান্তি লাভ হবেই। তবে সাজা সাধুর কাছে গেলে কিছুই হবে না।

ধর্ম

পরলোক আছে এই বিশ্বাস থেকেই ধর্ম-জীবনের সূত্র-পাত। তারপর ভগবান কি? জগৎ কি? প্রকৃত বিশ্বাসেই এক দিন এ সব বুঝা যায়।

ধর্মের ক্রিয়া খুব সূক্ষ্ম। ধৈর্য ধরে অগ্রসর হতে হয়। গুরু-নির্দিষ্ট পথে সাধন-ভজন করলে ধর্ম প্রকাশ হয়। তখন সাধক আনন্দে ডুবে যায়—আর সংশয় আসে না।

ধর্ম-জগতে সব অন্তর নিয়ে কারবার। অন্তর খাঁটি হলে তবে ভগবানের দর্শন মিলে। কত কামনা, বাসনা, কু-ভাব মনের মধ্যে কিলবিল করছে। সাধন-ভজন করলে এ সব ক্রমে-ক্রমে সরে যায়। মনটাকে আয়নার মত স্বচ্ছ করে ফেল। ময়লা আরশিতে (আয়নায়) কি মুখ দেখা

যায় ? ঠাকুর বলতেন—ভাঙ্গা আরশিতে কি কাজ হয় গো ? তিনি শুদ্ধ-মনের গোচর। শুদ্ধ পবিত্র অন্তর না হলে তাঁর মহিমা বুঝা যায় না।

ধর্মপথে কি মানুষ এমনি আসে ? দায়ে পড়ে আসতে হয়। একজন লোকের হয়ত অনেক টাকা-পয়সা আছে কিন্তু মনে শান্তি নেই। সংসারের কোন ব্যাপারেই আত্মা শান্তি পায় না। শান্তি লাভের জন্যই ধর্মের শরণ নিতে হয়।

ছোটবেলা হতে ছেলে-মেয়েদের মনে ধর্মবোধ জাগাতে হবে। তা না হলে বড় হয়ে ধর্মে সংশয় আসবে। বিশ্বাসই ধর্মের মূল। এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন ভগবানের উপর ও সত্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকে। তাহলে ধর্ম-বোধ তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য হবে এবং দেশের ও দশের সত্যকার কল্যাণ সাধিত হবে। ধর্মহীন লোক সত্যই পশুর সমান। ধর্ম ছাড়া অন্য কিছুতেই মানুষের ভেতরের সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না।

শাস্ত্রপাঠ

ভাগবত-পাঠ, শাস্ত্র-আলোচনা—শুধু শুনলেই কি হয় ? সেই কথা মত কিছু-কিছু জীবনে অভ্যাসও করতে হয়। তাহলে কল্যাণ হয় কি না বুঝতে পারবে। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলতেন—"শাস্ত্র আমায় কৃপা করে।"

তিনি সব সময় সাধনের ওপর থাকতেন বলে এ সব তাঁর সব সময়েই উপলব্ধি হ'ত।

গীতা অন্য কাউকে শুনাচ্ছি—এমন মনে করে পাঠ করবে না। ভগবানের কথা তাঁকেই শুনাচ্ছি—এই ভাব নিয়ে পাঠ করলে, মনে শুদ্ধি-অশুদ্ধির জন্য কোনও সঙ্কোচ-বোধ হবে না। বরং তাঁর কথা তাঁকেই শুনাচ্ছি, এই ভাব মনে উদিত হয়ে হৃদয় আনন্দে ভরে যাবে। এই ভাব নিয়ে চণ্ডী বা অন্য ধর্মশাস্ত্র পাঠ করলেও কল্যাণ হবে।

অনেক লোক মান, যশ বা বাহবা পাবার জন্য গীতা, চণ্ডী এ সব পাঠ করে। আবার কেউ-কেউ পরের কল্যাণের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও চণ্ডীপাঠ করে থাকে। এরূপ স্বস্ত্যয়নকারীর অকল্যাণ হয়। তার দৈন্য-দারিদ্র্য কোনো দিনই ঘুচে না। অমন করার চেয়ে ভগবানের কাছে ভক্তি-কামনা করে গীতা বা চণ্ডী পাঠ করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর দয়ায় সব অভীষ্ট পূরণ হয়ে যায়।

গীতা, ভাগবত লোককে শুনাচ্ছি এই ভাব মনে আনা খুব খারাপ। শ্রীভগবানকে শুনাচ্ছি এই ভাব নিয়ে সে সব পাঠ করলে কর্মক্ষয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার অভিমানও নাশ হতে থাকে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা করবে তাতেই অহংভাব নাশ হবে এবং চিত্ত শুদ্ধ হবে।

সদ্‌গুরু

সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলেই ঠিক ঠিক গতি হয় যদি কায়-মনোবাক্যে তাঁর আদেশ মেনে চলা যায়। গুরুবাক্যই প্রত্যক্ষ ধর্ম। যার গুরুর উপর ভক্তি-বিশ্বাস আছে তার ষোল আনা ধর্ম হয়। গুরুকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জ্ঞান করবে। ঠাকুর বলতেন স্বয়ং ঈশ্বরই কৃপা করে সদ্‌গুরুরূপে আসেন। সদ্‌গুরু ভগবানের করুণাঘন মূর্তি। তাঁর দয়া অসীম—অফুরন্ত। কোন কিছুরই দ্বারা তা মাপ করা যায় না। এই সব শাস্ত্র কেবল গুরুর কথাই বলছে।

শ্রীগুরুর প্রতি যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তার অনিষ্ট হওয়ার কোনও জো নেই। ভগবান তাকে সর্বদাই রক্ষা করেন। গুরুনিষ্ঠা হলে ঈশ্বর কী জিনিস তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হতে থাকে।

গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা হলে তাঁর গুণ ও শক্তি শিষ্যের ভেতর সঞ্চারিত হতে থাকে। তখন শিষ্যের জীবন বদলে যায়। সে ভগবৎ-আনন্দের অধিকারী হয় ও শান্তি-লাভ করে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করলে তবে ঠিক পথে গতি হয়। তখন তার পথ খোলা—এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তার আগে আর যত সব কর্মক্ষয়।

গুরুসেবা কি কম ভাগ্যের কথা? গুরুসেবায় অসম্ভব সম্ভব হয়। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকলে কোন

কিছুরই দরকার হয় না। আপ্‌সে (নিজে নিজে) সব হয়ে যায়। এমনি সদ্‌গুরুর মহিমা !

গুরুর সঙ্গ না করলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। তাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। আবার কারো-কারো বেশী দিন গুরুর সঙ্গ করে তাঁর প্রতি সংশয় ও সন্দেহ আসে। যখন সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস—এ সব আসবে তখন বরং একটু তফাতে গিয়ে থাকবে এবং খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর ভাল গুণ সব ভাববে ও ধ্যান করবে। তাহলে ও-সব চলে যাবে এবং পরে তাঁর সঙ্গে থাকলে অনিষ্ট হবে না—কল্যাণই হবে। গুরুতে কখনো মানুষ-বুদ্ধি আনবে না। সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে তিনি তোমায় কৃপা করেছেন জানবে।

দেখ্, সদ্‌গুরুর কৃপা পেয়ে আর দেরী করিস্ নে। তাহ'লে ঠক্‌বি। তাঁর কাছে ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কিছু নেই। তিনি যা দয়া করে দিয়েছেন, তাই সব। তার চেয়ে বেশী আর কেউ দিতে পারে না—অবতারও না। দেখছিস্ না গুরু-মহিমা বোঝবার জন্য অবতার-পুরুষরাও গুরুকরণ করেছেন। এতো দেখেও মানুষের চৈতন্য হয় না—সব কর্মফল।

সাধন-ভজন

একটা শুদ্ধ ভাব নিয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। ভাবের জোর না থাকলে দশ জনের কথায় সংশয় আসতে পারে।

কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। গুরুমুখে যে মন্ত্র পাবে তাতে কখনো সংশয় করবে না। সাধন করলে তাতে বস্তুলাভ হবেই।

সাধন-ভজন খুব গোপনে ও নির্জনে করতে হয়। তাতে দিনদিন শক্তি বাড়ে। উপলব্ধির কথা সবাইকে কখনো বলে বেড়াবে না। এ সব গুপ্ত না থাকলে পোক্ত হয় না। তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) সাধন-ভজন মনে, বনে ও কোণে করতে বলতেন। লোক-দেখানো ভাব তিনি আদৌ দেখতে পারতেন না। তাতে বস্তুলাভ তো হয়ই না, বরং হানি হয়।

মেয়েদের ব্যাপারে সাধক সব সময় এড়িয়ে চলবে। যেখানে মেয়েলোক, সেখান থেকে দূরে থাকবে। সাধন-ভজনের দ্বারা শরীর-মন শুদ্ধ করতে হলে মেয়েদের হাওয়া (বাতাস) যেন গায়ে না লাগে। মেয়ে সাধকদেরও তেমনি পুরুষদের সংস্রব হতে সর্বদা তফাতে থাকা উচিত।

সাধন-ভজন-পথে থাকতে হলে মনকে বেশী ছড়িয়ে রাখতে নেই। এ জন্য মাঝে-মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন করতে হয়। বেশী ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কী দরকার ? গুরু-নির্দিষ্ট পথ ধরে সাধন করে যাও। অভ্যাসে সব হয়।

এখনকার লোকেরা সব আলসে হয়ে পড়েছে ; সাধন-ভজনের নামে ভয় পায়। এ সব তমোগুণের লক্ষণ। অভ্যাসের দ্বারা তমোগুণ নষ্ট হয়। তখন নামে রুচি আসে

এবং সাধন-ভজন করবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করে। লক্ষ্য ঠিক হলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

সাধন-ভজন করে না বলেই মানুষ মায়ার বিপাকে কষ্ট পায়। তাঁর দিকে গতি করলে (এগিয়ে গেলে) মায়া আর কষ্ট দিতে পারে না।

যে সাধন-ভজন নিয়ে অাঁকড়ে পড়ে থাকবে—কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না, ভগবান তাকে অবশ্যই কৃপা করবেন। তাঁকে ধরে থাকলে তাঁর কৃপা হবেই। তিনি কৃপাময়—দয়াময়। তাঁর কৃপা তো সব সময়ই রয়েছে। ঠাকুর বলতেন, "তাঁর কৃপা-বাতাস তো সর্বদাই বইছে; তোরা পাল তুলে দে।"

ভোগেচ্ছা প্রবল হলেই রোগ। ভোগীর কাছে সাধন-ভজন বিস্বাদ বলে মনে হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা গুটিয়ে আনলে মন সুস্থ হয়। সুস্থ মনে সাধন-ভজন করলে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়। তখন সংসার আর বাধা দিতে পারে না।

মন-মুখ এক করাই হচ্ছে সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য। মনে ভাবছ এক আর মুখে বলছ হরি-হরি—তা হবে না। সাধন-পথে মন-মুখ এক না করলে অভীষ্ট লাভ হয় না। দেখ ভাবের ঘরে চুরি কোরো না। ঠাকুর এ ভাব আদৌ দেখতে পারতেন না। কপটের ধর্ম হয় না। তিনি কপটতা হতে বহু দূরে। শিশুর মত সরল হও। হৃদয়

পবিত্র কর। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর মনের ময়লা ধুয়ে দেবার জন্য। মন-মুখ এক করে প্রার্থনা কর— তাঁর জন্য কাঁদ। তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন। তিনি কৃপা না করে থাকতে পারেন না। কৃপাময় তিনি।

যখন আপদ-বিপদ থাকে না—ঝঞ্ঝাট কম থাকে— দিনগুলো অনেকটা নিশ্চিন্তে কাটে—সে সময়টা একটু গরজ করে ধর্ম-কর্ম, সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গ করে নিতে পারলে মহালাভ হয়। মনটা ঠাণ্ডা থাকলে সাধন-ভজনে চিত্তের প্রসাদ লাভ হয় এবং একটা অনির্বচনীয় আনন্দও অনুভব করা যায়। তুলসীদাস বলেছেন—দুঃখের সময় অনেকেই হরিনাম করে, কিন্তু সুখের সময় তাঁর নাম করলে আর কোনো দুঃখ থাকে কি?

সাধন-ভজন করলে সংসার আপনা হতেই সরে যায়। সংসারে থেকে সাধন-ভজন করলে সংসার ভয়ের এবং দুঃখের হয় না। সাধন-ভজন করে না বলেই সংসারে এত ভয় ও দুঃখ ভোগ।

যে সব আদর্শ গুণের অধিকারী হবার জন্যে মানুষ সারা জীবন চেষ্টা করছে, সাধন-ভজনের দ্বারা সেগুলি সহজেই লাভ হয়। যথার্থ সাধক তখন বড় জিনিস—ঈশ্বরলাভের দিকে অগ্রসর হয়—যা লাভ হলে মানুষ এ জীবনেই সর্ব-গুণান্বিত হয়। তখন চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। তাঁকে জানলে সবই জানা হয়ে যায়—তাঁকে লাভ

করলে সবই পাওয়া যায়।

সাধন অবস্থায় 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এইটিই ঠিক ভাব। কারণ জগতের দিকে তাকালেই হয়তো জড়িয়ে পড়তে পারে। মোহ, সংশয়, বাসনা—কত কি এসে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র আছেন, আর সবই মায়া—স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এইরূপ একমুখী ভাবে থাকাই যথার্থ পথ।

ঠিক ঠিক সাধক কি করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। এক লক্ষ্য হলেই তাঁকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে ধ্রুবা স্মৃতির কথা আছে। সাধন-ভজন করলে শাস্ত্রের সব জিনিস একে একে উপলব্ধি হতে থাকে। শাস্ত্রে তখনই ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য আশ্রয় করে সাধন-পথে এগিয়ে যেতে হয়।

সাধন-পথে যদি অনেক দেব-দেবীর দর্শন হয় ও তাঁদের ভাল লাগে—তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তাঁদেরকে ইষ্টেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলে জানবে। তাঁরা ইষ্টেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এক ইষ্টই নানা রূপে নানা ভাবে লীলা করছেন। ইষ্ট যেন ভুল না হয়। সাধন-ভজন করতে করতে মন একবার উঠে গেলে তাঁতেই (ইষ্টে) সমাহিত হয়। তখন কোনো দ্বন্দ্ব বা ভেদবুদ্ধি থাকে না। সর্বত্রই ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়। এরূপ অবস্থা সাধন-সাপেক্ষ।

সাধন-ভজন ছাড়া এ জীবনে কিছুই হবার উপায় নেই—যে যতই বলুক না কেন। সাধুসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ,

শাস্ত্রপাঠ—এ সবই সাধন-ভজনের অঙ্গ। এ সমস্তুতে উদ্দীপনা আসে। এ সব কিন্তু মূল নয়—মূলকে ধরবার উপায় মাত্র। আমরা মূল ভুলে কেবল এ সব নিয়েই বিচার করি আর কথা বলি। মূল না ধরলে সবই বিফলে যাবে। খুব সাধন-ভজন কর। শাস্ত্র বলেন, ভগবানকেও তপস্যা করে ভগবান হতে হয়েছে। এ সব কি মিথ্যা কথা?

কর্ম (সাধন-ভজন) ছাড়া তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানবার বা বুঝবার কোনো রাস্তা নেই। ফাঁকি দিয়ে কখনো ধর্ম লাভ হয় না। জীবন-পণ করে খাটলে তবে বস্তু লাভ হয়।

কোন্‌টা কর্ম, কোন্‌টা অকর্ম—এ সব যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝে বা জেনে বিশেষ লাভ হয় না—অযথা পণ্ডশ্রমই হয়। সাধন-ভজন করলে নিজে নিজেই সব বুঝা যায়। কর্ম অর্থাৎ সাধন-ভজন দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয়। কর্মই কর্মকে জানিয়ে দেয়।

যে প্রীতির সঙ্গে পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ও স্মরণ-মনন করে—অর্থাৎ ভাল লাগে বলে করে, তার খুব তাড়াতাড়ি হবে। কেন না, তার ভেতর হতে স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। গোপীদের এই ভাব ছিল—"অহেতুকী ভালবাসা।"

কিছু দিন নিষ্ঠার সাথে গুরুর দেওয়া মন্ত্রের সাধন করলে মনে দানা বাঁধে। তখন বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সাধন করে যে বিশ্বাস আসে সেটিই ঠিক বিশ্বাস। মনে একবার দানা বেঁধে গেলে দেহ ও মনে শান্তি আসে। সূতো দিয়ে যেমন

মিছরির দানা বাঁধে, সাধন-ভজন করে তেমনি মনে দানা বাঁধে। তখন ভাব গাঢ় ও দৃঢ় হয়—কর্মশক্তি খুব বেড়ে যায়। সব কাজেই আনন্দ ও বল পাওয়া যায়। এত সহজে সাধন-ভজন ছাড়া, এমনটি আর অন্য কিছুতেই হয় না।

নামে রুচি হলেই অনেকখানি সাধন হল। নাম করতে করতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। অনুরাগ হলে তাঁকে পাবার পথ খুলে যায়। এ যুগে নামেই তাঁকে পাবার উপায়! ভগবানে অনুরাগ হলেই চিত্ত নির্মল হতে থাকে এবং বিষয়-বাসনা স্বার্থপরতা প্রভৃতি আপনা আপনিই কমতে থাকে। তাঁর ওপর টান হলেই সংসারের টান নিজে নিজেই ঢিলে হয়ে যায়—এমনি তাঁর মহিমা!

ভোগের বাসনা যতক্ষণ মনের ভেতর খেলা করবে, ততক্ষণ ধর্মজগতে কিছুই লাভ হবার জো (উপায়) নেই। সাধন-ভজন করলে সে সমস্ত বাসনা নিজে নিজেই দমে যায়। তখন তারা আর বিশেষ মাথা তুলতে পারে না। মন শুদ্ধ হবার সাথে সাথে সেই প্রবৃত্তি নিজে নিজে নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে খুব বিচার করে ভোগের ইচ্ছাকে ঘৃণা ও অসার মনে করে সমূলে মন থেকে উঠিয়ে দিতে হয়। তারপর সাধন-ভজন করতে থাকলে হু-হু করে এগিয়ে যাওয়া যায়। এ বিষয়ে বৌদ্ধদের ভাবটা খুব ভাল। তারা ভোগ-বাসনাকে তন্ন তন্ন করে মন থেকে শূন্য করবার চেষ্টা করে। ঠাকুর অবশ্য ভোগ-বাসনার কারণকে সংক্ষেপ করে দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন—'কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ।' তিনি পরে বলেছিলেন—'কাম-ত্যাগ' করলেই হয়ে গেল। এইটিই ঠিক কথা। কাম-ভাবকে ত্যাগ করতে পারলেই পনের আনা কাজ হয়ে যায়। বাকী সব তখন আর জোর করতে পারে না। এ সব বিবেক আর অভ্যাস-সাপেক্ষ। সাধন-ভজন না করলে এ সব কিছুই হবার জো নেই—সে কথাও বলে দিচ্ছি।

সাধন-ভজন করলে ভেতরের ঈশ্বরীয় গুণ প্রকাশ পায় এবং তাঁকে একটু একটু করে জানা যায়।

খুব উঁচু আদর্শ ধরে ক্রমে ক্রমে সাধন-পথে এগুনো উচিত। নইলে যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়ে থাকতে হবে।

ইষ্টের প্রতি মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে সাধন। প্রথম প্রথম মন বসতে চাইবে না। নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে আছে, এক দিকে আনতে চাইলে সে হঠাৎ রাজী হবে কেন? অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে আস্তে আস্তে বশীভূত করে ইষ্টে বসাতে হয়। মন একাগ্র হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও ইষ্টের স্বরূপ ভক্তের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়।

সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠবার সময় যেমন ধাপে-ধাপে মুখ উঁচু করে ছাদের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠতে হয়, তেমনি মনও খুব উঁচু করে নীচের দিকে না তাকিয়ে কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য করে ধাপে-ধাপে উঁচুতে উঠে যেতে হয়। নীচের

দিকে (কাম-কাঞ্চনে) নজর থাকলে সাধকের পড়ে যাবার খুব সম্ভাবনা। যেমন গিরিশবাবু (মহাকবি নাট্যসম্রাট) বিল্বমঙ্গলে সাধকের চরিত্রে দেখিয়েছেন।

কিছু দিন নিয়ম করে নিষ্ঠার সাথে সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরে নির্ভরতা আসতে থাকে। ভগবানের ওপর নির্ভর করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। তাঁতে নির্ভরতা কি অমনি আসে? কত সাধুসঙ্গ, ধ্যান-জপ করলে তবে ভগবানে নির্ভরতা আসে। তার জন্য কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করেছিলেন বলে বেঁচে গেলেন।

মন-মুখ এক কর। কেবল মুখেই বলছ—ভগবান চাই, ভগবান একটু দয়া করলে না। কিন্তু প্রাণের ভিতর তাঁর অভাব অনুভব কর না এবং তাঁকে ঠিক ঠিক চাও না। যদি তাঁকে ভালবাস, তবে বিষয় কামড়ে পড়ে রয়েছ কেন? কি চাও সেইটে ভাল করে লক্ষ্য করে আগে দেখ। তাঁর কাছে ভাবের ঘরে চুরি করলে কোন কালেই মুক্তি হবে না। অন্তর হতে তাঁর জন্য যদি অভাব বোধ হয় এবং তাঁকে পাবার জন্য যদি সাধন-ভজন কর তবে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা হবে।

সাধন-রাজ্যে ভাবের ঘরে চুরি চলে না। মন-মুখ এক করে সাধন-ভজন করতে হয়। সেটি যার হয়নি সে ভগবান হতে অনেক দূরে আছে। প্রাণে একটা জিনিস চাইছ আর মুখে লোক-দেখানো হরি হরি—সারা জীবন করলেও কিছুই

হবে না। ঠাকুর যেমন বলতেন—নোঙ্গর মাটিতে ফেলে সারা রাত্রি নৌকোয় দাঁড়টানা হচ্ছে।

যদি ভগবানের জন্য প্রাণে ঠিক ঠিক খিদে ও পিপাসা জাগে, তবে তাঁর দয়া হবে। তাঁর কাছে ভণ্ডামি চলবে না, তিনি অন্তর দেখেন। তিনি যে প্রত্যেক জীবের অন্তরে দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে সবই দেখছেন।

জীব যদি সাধন-ভজন করে এবং ঠিক ঠিক তাঁকে চায় তবে সে নিশ্চয়ই তাঁকে পায়। ঠাকুর এ কথা দিব্বি করে বলে গেছেন। তিনি বলতেন—মাইরি বলছি, যে চায় সেই পায়। আমরা তো তাঁকে সত্যি সত্যি চাই না—আমরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করি। তাই তো এত দুঃখভোগ।

মনের অনেক ভেল্কি আছে। সাধন-ভজনের দ্বারা একটু চিত্ত স্থির হলেই খুব কিছু একটা হয়ে যায় না। অনেক গুপ্ত সংস্কার মনে থাকে। সে সব হঠাৎ এক দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সাধকের তখন সামাল-সামাল অবস্থা হয়। সে জন্যে আগে থেকেই তৈরী থাকতে হয়। মনকে বিশ্বাস করা যায় না, কখন যে কোন্ অধঃপাতে নিয়ে যাবে তা বোঝা কঠিন।

নিয়মিত জপ-ধ্যানের দ্বারা মনকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলেছেন যে, মনকে দৃঢ়ভূমি করতে হয়। এ সব জেনে সাধনা করলে অনেক বিপদের হাত এড়ানো যায়।

সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব কিছুই ভগবানে অর্পণ করলে, কর্মফল আর আবদ্ধ করতে পারে না। এমন কি নিজেকেও তাঁর পায়ে বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতে হয়। এই করতে করতেই তাঁতে আত্মসমর্পণ হয়। নিরন্তর অভ্যাস আর সাধন-ভজন না করলে এ সব উপলব্ধি হয় না। শুধু কথার কথা শুনতেই বেশ। কর্ম না করলে ধর্ম হবে কোত্থেকে ?

সাধুরা দস্যু রত্নাকরকে কাঁধে করে নিয়ে সাধন-পথে এগিয়ে দেননি। তাঁকে নিজে নিজেই কঠোর সাধনা করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। সাধু কেবল সদুপদেশ দিয়ে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেন—দিগ্‌দর্শন করান মাত্র। সাধককে কিন্তু নিজে পায়ে হেঁটে সেই রাস্তা ধরে এগুতে হবে। তা যদি না পার যেখানকার ঘুঁটি সেখানেই পড়ে থাকবে—যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে হবে।

ঠাকুর সবাইকে এগিয়ে যেতে বলতেন। এগিয়ে না গেলে কি রত্ন পাওয়া যায় ? সারা জীবন সাধন-ভজন না করে কেবল অলসভাবে বসে থাকলে কি ভগবানলাভ হয় ? তিনি কাজ করিয়ে তবে মজুরি দেন। অলস গোঁফ-খেজুরের মত দিন কাটালে কি সেই পরমানন্দের কণামাত্রও লাভ হয় ? ঠাকুর গাইতেন—"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে, সে যে ভাবের, বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাব কি ধরতে পারে ?"

সৎ কাজ না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে

ধ্যান-ধারণা করবে কি করে? আর ধ্যান-ধারণা সাধন-ভজন করতে করতে তবে তো এগুতে পারা যাবে। এ কথা যে বুঝে চলতে পারে সে ভাগ্যবান বৈ কি। এই দেখ, আমাদের গুরুভাইরা ঠাকুরকে দর্শন করে ও সেবা করে তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা বলে কি তাঁরা ধ্যান-ধারণা, সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাঁদেরকে কি কঠোর তপস্যা করতে হয়নি? তাঁরা তো বলতে পারতেন যে, ঠাকুর সকলের উপরেই কৃপা ঢেলে গেছেন, ভজন-সাধন করবার আর কি দরকার! কিন্তু তাঁরা ঠাকুরের কৃপায় বুঝেছিলেন যে, অনন্তের সাধন-পথও অনন্ত, জীবনও অনন্ত-কাল ধরে চলেছে—এই দেহ নাশ হয়ে গেলেও সব কাজ ফুরিয়ে গেল না। আমরা সবাই অনন্তধামের যাত্রী।

ভগবানের দুয়ারে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। তুমি দেখা দাও আর না দাও, তোমাকে ছাড়ছি নে (নেহি ছোড়েঙ্গে)। এই ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে ভগবান আপ্‌সে (নিজেই) দেখা দেবেন। ভক্তের ঠেলায় ভগবান অস্থির। এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন—ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান—এই তিনের সম্বন্ধ সমান। ঠাকুর বলতেন, খানদানী চাষার মত লেগে থাকতে। কিছুকাল সাধনা করে কিছু অনুভব না করলে সাধন-ভজন ছেড়ে দেবে না। সাধনরাজ্যের ব্যাপারই এই রকম। লেগে থাকলে কালে অনুভূতি হবেই। ঠাকুর আমাদের বলতেন,—এক ডুব দিয়ে যদি রত্ন না মেলে

তবে রত্নাকরকে রত্নশূন্য ভাবতে নেই। বার বার চেষ্টা করতে হয়।

ঈশ্বর অনন্ত—অনাদি। তাঁর ভাবও অনন্ত। পরাবিদ্যা বা পরাজ্ঞানের ইতি নেই। এখানকার বিদ্যার একটা সীমা আছে—এত দূর পর্যন্ত শিখলে-পড়লে বিদ্যাশিক্ষার এক রকম চূড়ান্ত হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্ব-পথের শিক্ষার কি ইতি (সীমা) আছে? আগে আগে আমার মনে হত যে, খুব ভজন-সাধন করে স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে আছেন – তার নাগাল পাব। এগিয়ে গিয়ে দেখি, যে জায়গায় স্বামীজী ছিলেন সেই জায়গা থেকে তিনি আরও সাধন করে বহু এগিয়ে পড়েছেন। তাঁর সব সাধন হয়ে গেছে বলে তিনি চুপ করে অলসভাবে বসে থাকেন নি। এ যে অনন্তের সাধন-ব্যাপার। অনন্তের রাজত্বে যাঁরা ঠিক রাজভক্ত প্রজা তাঁরা কি অলস হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন? সাধন-ভজনের দ্বারা ক্রমেই এগিয়ে যান।

সবাই তো শুধু ভক্ত, কিন্তু ভক্ত হওয়া বড় শক্ত—এক-জামিনে (পরীক্ষায়) দাঁড়াতে পারে না। এখনকার সব কেমন ভক্ত? ভেতরে ঠন্‌-ঠন্‌ (অর্থাৎ সার বস্তু কিছুই নেই)। একটু ল্যাজে পা পড়লে অমনি অভিমানে ফোঁস্‌ করে ওঠে। সাধন-ভজন না করলে কি রাগ অভিমান যায়? এখনকার ভক্তরা কেবল বচনে আর ভোজনে দৃঢ়। ভেতরে ফাঁপা—টুসকির ভর সয় না; অনুরাগ ও ব্যাকুলতা কোথায়?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কত উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন—হে অর্জুন, এই হল আদর্শ। এই ভাবে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধন করে সংসারের মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তুমি একটা পথ বেছে নিয়ে মোহ থেকে নিষ্কৃতি পাও। যোগী হও, না হয় নিষ্কাম কর্ম কর। তাও না পারলে সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হও, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর এবং আমাতে তন্ময় হয়ে যাও। তাহলে আমি তোমায় মুক্ত করতে সমর্থ হব। দেখ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও সাধন-ভজন না থাকলে ভক্তকে কৃপা করতে পারছেন না। কত জন্মের সাধনা ছিল বলেই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সখা হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাঁদের দিয়ে কত কর্ম করিয়ে নিয়েছিলেন। এতেও যদি জীবের ভুল না ভাঙ্গে তাহলে আমরা আর কি করবো? এটি অতি সত্য কথা যে, সাধন-ভজন ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। আমাদের ঠাকুর স্বয়ং ভগবান হয়েও কত কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে তপস্যা করে গেলেন।

পূজার্চনা

দেব-দেবীর পূজার্চনা করবার পূর্বে মনে যে বিষয়ের সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্প নিয়ে ভক্ত যখন পূজার জিনিস সংগ্রহ করে, তখনই ঐ সব জিনিস ভগবানে নিবেদিত হয়ে যায়। পরে কেবল পূজার মন্ত্র পাঠ করে ঐ সব জিনিসকে বাহ্যিক

নিবেদন করা হয়। মন্ত্র আওড়ালেই যে ঠাকুর এসে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, তা নয়। ঠাকুর ভাবগ্রাহী, তিনি ঐটিই গ্রহণ করেন মাত্র। যিনি পূজার আয়োজন করেন এবং যিনি পূজা করেন, এই দু'জনের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং ভাব-ভক্তিই আসল। জিনিসপত্রের রকম-বেরকম আয়োজন আড়ম্বর মাত্র—বাহিরের শোভা ভিন্ন কিছুই নয়। দেবতা আড়ম্বরে ভুলেন না—তিনি দেখেন অন্তর। বাহিরের দিকটায় খুব বেশী ঝোঁক দিলে ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হয়।

যদি কেহ অনেক টাকা খরচ করে পূজার আয়োজন করে, কিন্তু হৃদয়ে তার ভক্তির লেশ মাত্র না থাকে—মনে মনে হয়তো ভাবছে যে ছেলেমেয়েদের কথা এড়াতে না পারায় এতগুলো টাকা বাজে খরচ হয়ে গেল, মাঝখান থেকে বামুনের বেশ দু'পয়সা হয়ে গেল; আর যদি সেই পূজায় পূজারী ভক্তিহীন ব্যবসাদার হয়, যদি সে খতাতে থাকে কত জিনিস আর কত টাকা পাওয়া যাবে, তবে ঐ পূজা বৃথা হয়ে যায়।

পূজারী এবং যে পূজা করাচ্ছে—এই দু'জনের মধ্যে যদি একজনেরও ভক্তি-বিশ্বাস থাকে; অর্থাৎ পূজক যদি ভক্তিমান হয় এবং ভাবে—এমন সুন্দর প্রতিমা, এত উপকরণ দিয়ে যখন পূজা করবার সৌভাগ্য ঘটেছে তবে প্রাণ দিয়ে পূজা করি; তাহলে কর্মকর্তা শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন হলেও কেবল পূজারীর ভক্তির জোরেই তার কল্যাণ হয়ে

যায়। ঠিক তেমনি পূজারী ভক্তিহীন ব্যবসাদার হলেও কর্তা যদি ভক্তিমান হয় এবং কাতরে দেবতাকে তার প্রাণের কথা জানায় তাহলেও পূজা সফল হয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে পূজা করা ভাল, তা না হলে সমস্ত আড়ম্বরই বৃথা।

পুরুষকার

সত্যলাভের জন্য কারো কথায় বা ভরসায় বসে থেকো না। কেউ কারো কিছু করে দিতে পারে না। একমাত্র অবতারপুরুষদের পক্ষেই তা সম্ভব। ঈশ্বরলাভের জন্য নিজেকেই সাধন করতে হবে। নিজে নিজে সাধন-ভজন করে সত্যকে উপলব্ধি কর। কারো অপেক্ষায় বসে থেকো না, গুরুশক্তিই সহায়ক হবে। সাধন-পথে যেমন বহু বিঘ্ন আছে তেমনি সুবিধাও আছে। যে এই পথে ঠিক-ঠিক চলে সে অলক্ষ্যে বহু সাহায্য পায়। ঠাকুরের সাধনায় হয়েছিল, তাঁর যখন যেমন গুরুর দরকার হয়েছিল সব নিজে নিজেই এসে জুটেছিলেন ও তাঁকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়েছিলেন।

চেষ্টার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়। যদি চেষ্টাতেও কোনো কাজ সফল না হয়, তাহলে বুঝবে আন্তরিকতা বা কৌশলের অভাব রয়েছে। ভুল ত্রুটি সেরে নিয়ে আবার কাজে লেগে যাবে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে ভগবান নিজেই তোমার সঙ্গে কাজে লাগবেন। কখনো চেষ্টা ত্যাগ করবে না। বার

বাধ করতে করতেই হবে। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে কোনো কালেও কিছু হবে না।

দুর্বলতা ধর্মের অন্তরায়। মন দুর্বল থাকলে সাধকের পতন হতে পারে। খুব মনের জোর চাই। দুর্বলতাকে মহা পাপ মনে করবে। এ ভাবকে কখনো মনে স্থান দিও না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—আমিই পুরুষকার। স্বামীজী বলতেন—দীনহীন ভাবগুলোকে কুলোর বাতাস দিয়ে মন হতে ফেলে দিবি।

কৃপা

ঈশ্বরের কৃপা পাবার উপায় হচ্ছে চোখের জল। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে কৃপা ভিক্ষা করতে হয়। তাঁর দয়া তখন হয় যখন তিনি বুঝেন, হাঁ, এ ঠিক ঠিক আমায় ভালবাসে ও আমাকে চায়– কাম-কাঞ্চনে এর মন নাই। এদিকে বিষয়-টান রয়েছে, ওদিকে মুখে শুধু 'কৃপা কর', 'কৃপা কর' বললে কি হবে? তাতে কি আর তাঁর আসন টলে? যেদিন এ কপট ভণ্ডামি চলে যাবে এবং সরল প্রাণে তাঁর দয়া পাবার জন্য কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখ জানাতে পারবে, সেই দিনই তাঁর কৃপা পাবে। কারণ তিনি সরল ও সত্যবাদীর নিকট প্রকাশিত হয়ে থাকেন।

তাঁর কৃপা হয় কার উপর? যে তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে, তাঁর জন্য যার অন্তর ছট্‌ফট্‌ করে, তার

উপর। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ভাবছেন। কিন্তু বিষয়াসক্ত জীবের প্রাণ কি তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হয়? যেদিন মন সংসারে নানা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে—ঠাকুর তোমার কৃপা বিনা আর প্রাণ বাঁচে না—এই বলে কাতরভাবে তাঁর চরণে শরণ নেবে, তাঁর দিকে এক পা এগুবে, সেই দিন সে বুঝতে পারবে যে, তিনি কৃপাময়, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, কৃপা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে জীবের দিকে শত পা এগিয়ে এসেছেন।

কর্মফল

কর্ম অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। তুমি যেমন করবে তোমার বুদ্ধিও তেমনি হবে। সৎকাজ, জপ, ধ্যান প্রভৃতি উত্তম কর্ম করলে মন ঈশ্বরের দিকে যায় এবং জীব শান্তি পায়। কিন্তু তা না করে ভোগ, বিলাস, স্ফূর্তি ও মিথ্যার মধ্যে সময় কাটালে মনের অধোগতি হয়। তাতে অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করতে হয়—জীবন বৃথা হয়ে যায়।

কর্মফল মানা উচিত। শুভ কর্ম শুভ ফল দেবে আর অশুভ কর্মের অশুভ ফল হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল—এটি ঠিক কথা। ভগবানে বিশ্বাস হলে অশুভ কর্মের ফল খণ্ডন হয়ে যায়। তখন মন আর অসৎ কর্মে লিপ্ত হয় না।

কারো মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এখন না হলে একদিন তার ফল ভুগতে হবে। আত্মারূপী ভগবান প্রত্যেক

জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে রয়েছেন। এই জন্য যে দুঃখ দেয় সে দুঃখ পায় আর যে মানুষের মনে সুখ দেয় ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন, তাতে সে সুখ পায়। একেই বলে কর্মফল। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পেতে হবে। লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে, আর চিনি লবণ ভেবে খেলেও মিষ্টি লাগবে।

কর্মফলে বিশ্বাস করা উচিত। কর্মের উপর সংসার চলছে। যে রকম মানুষ কাজ করছে সেই রকম ফল পাচ্ছে। সাধন-রাজ্যেও ঠিক তেমনি। বুদ্ধদেব কর্মের উপর ধর্ম স্থাপন করে গিয়েছেন।

সংস্কার

মানুষ মাত্রেই সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সংস্কারের বশেই মানুষ ভাল-মন্দ সব রকম কাজ করে থাকে। সংস্কার সৎ এবং অসৎ দুই-ই আছে। সংস্কারবিহীন মন হওয়া বড় কঠিন। জীবের সংস্কার কি সহজে যায়? একবার সাধুসঙ্গ বা তীর্থভ্রমণ করলেই কি জন্ম-জন্মান্তরের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়? এ জন্য বহু খড়-কাঠি পোড়াতে হয়।

যিনি সেই আনন্দময় ভগবানকে লাভ করে সর্বদাই আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছেন, এমন সাধুর সঙ্গ করতে করতে তবে মনে সত্ত্বের প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে

সঙ্গে অসৎ সংস্কারগুলো ক্ষীণ হতে থাকে। এই ভাবে সৎ সংস্কার প্রবল হলে অসৎ সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নাশ হয়ে যায়। তখন মন সংস্কার-বিহীন হয়।

সংস্কার যাওয়া বড়ই কঠিন। ভগবানের কৃপা ভিন্ন হয় না। অনেক বড়লোকের ছেলে, কোনো অভাব নেই—তবুও চুরি করে। এ সব পূর্বজন্মের সংস্কার। সেই জন্যেই তো জন্মান্তর মানতে হয়। জন্ম নিয়ে ভাল কাজ করলে শুভ সংস্কার হয়। তখন অশুভ সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

মন

মন সম্বন্ধে সাবধান। মনের মধ্যে কামনা-বাসনা কিল্‌বিল্ করছে। কখন যে কোন দিকে অধঃপাতে নেয় তার ঠিক নেই। সাধন-ভজন করে মন পবিত্র হলে অসৎ কামনা আর মনে উঠতে পারে না তাই বলি,—সাধন কর; কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ তখন মনই তোমাকে বলে দেবে। মন তোমার গুরু হয়ে যাবে।

মন বেশীর ভাগই বিষয়-সুখ চায়। তাই মানুষ এত দুঃখ-কষ্ট পায়। বিষয়ের ধ্যান করছে বলে এত দুঃখ। বিষয়-সুখী মন স্ত্রী, পুত্র, ধন এই সবেতেই মত্ত হয়ে থাকে। সর্বদা বিষয়-চিন্তা করে করে এমন একটা সংস্কার জন্মায় যে, মন তখন আর উচু ধাপে উঠতে পারে না। যদি বা দৈবাৎ ওঠে

তো আবার পড়ে যায়। ঠাকুর যেমন বলতেন—বেজীর ল্যাজে আধেলা ইট দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে সে যতই লাফ দিয়ে দেয়ালের গর্তে উঠতে চেষ্টা করে ঐ ইটের ভারে ধুপ করে নীচে পড়ে যায়। সংসারীর মন ঠিক তেমনি বিষয়ের টানে ঐ বেজীর মত নীচে পড়ে যায়—উঠতে পারে না। কিন্তু সেই বিষয়-টানের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিলেই প্রেম হয়ে যায়। কিন্তু জীব তা না করে তার মনকে কাম-কাঞ্চনের আঁস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছে। এমনি তাঁর মায়া।

মনটা মায়া-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এইজন্য সে বার বার এত চোট খায়। কিন্তু তবুও ঐ বিষয়েরই ধ্যান করে। ঠাকুর বলতেন—'মন বেচারার কি দোষ আছে? শ্যামা মা তাকে আঁখি দিয়েছেন। শ্যামা মা তাকে দয়া করে ছেড়ে না দিলে তার আর উপায় নাই।

ঠাকুর তো অনেককেই বলতেন—মনের মোড় ফিরিয়ে দাও, কাম-ক্রোধের মোড় ফিরিয়ে ভগবন্মুখী করে দাও। কিন্তু জীবের সাধ্য কি যে, বিষয়-মুখী মনকে ভুলেও ভগবানে দেয়। সে সাধ্য জীবের নেই, কারণ মন গভীর সংসার-কূপে পড়ে রয়েছে। কেউ এসে তাদের টেনে তুলতে চাইলেও উঠতে চায় না। কি মজা দেখ, কাম-কাঞ্চনের মোহ তাদের এমনি পেয়ে বসেছে যে, টেনে তুললেও উঠতে চায় না। তারা দুঃখ ভোগ করছে তবুও তাদের কোন বোধ নেই—একেবারে বেহুঁশ।

ভোগ-বাসনা আর কু-ভাব থেকে খুব সাবধান। ভুলেও এদের মনে স্থান দেবে না। মনের যখন নিম্নগতি ক্রমশঃ হতে থাকে তখন মানুষ বুঝেও বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন ভালভাবে বুঝতে পারে তখন আর ওঠবার শক্তি থাকে না। সাধককে ভোগ-বাসনা অলক্ষ্যে অধোদিকে নিয়ে যায়। কামনা-বাসনার একটু ফেঁকড়ি পর্যন্ত মনে থাকলে সে মন ঈশ্বরের দিকে গতি করে না। ঠাকুর তো বলতেন যে, সুতোর আগে একটু ফেঁসো থাকলে সূচে ঢোকে না। বৈরাগ্য ও অনুরাগ দ্বারা মনকে সব সময় পবিত্র রাখবে। কথায় বলে—'মন চাঙ্গা তো কুট্‌রী মে গঙ্গা।'

সংসার

সংসারে একটি লোকের উপর অনেক লোক নির্ভর করে। তার বিষম দায়িত্ব। তার শরীরের প্রতি বাড়ীর সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি গোলমাল হয় তবে সংসারটি ছারখার হয়ে যায়। অবস্থান্তর হলে বড়ই বিপদ। সুখে থাকতে যারা আরামে কাটিয়েছে অবস্থান্তর হলে তাদের বড়ই কষ্ট হয়। এ জন্য যখন যে অবস্থায় ঈশ্বর রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভাল। ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করতে হয়—যাতে সব সহ্য করতে পারি, সব অবস্থায় যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি। ঠাকুরের মহাবাক্য 'শ' 'ষ' 'স' অর্থাৎ সহ্য কর—সহ্য কর—প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত।

বেশী রাগ-অভিমান করতে নেই। সংসারে থাকতে হলে একটা না একটা লেগেই থাকে। সে সব ভাবতে গেলে মন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভগবানকেও অনেক সময় ভুলে যেতে হয়।

যৌবনের বেগ ও অর্থের লালসা যে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে, সংসারে থেকেও সে অনায়াসে ভব-সাগর পার হয়ে যায়।

সংসারে সব আমার-আমার আমি-আমি করে। অহংবোধই মূর্খতা। মানুষ একবার ভাল করে ভেবে এবং বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, এ সংসারে কে কার? সাধন-ভজন করলে তবে নিত্য ও অনিত্যের জ্ঞান হয়।

সংসারের অবহাওয়া বড়ই খারাপ। সদাই জীবকে প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করে রাখছে। জীবই যে শিব, মায়া এ কথা সকলকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। মায়া-রহিত মহাপুরুষদের স্মরণ করলে এ মায়ার হাত থেকে এক দিন বেঁচে যাবে। কিন্তু সংসারে থেকে যদি গিরিশবাবুর অনুকরণ কর, যদি ভাব যে, তিনিও ত শেষে ভক্ত হয়েছিলেন—আমরাই বা তাঁর মত হব না কেন—তাহলে কিন্তু সবই বিগড়িয়ে ফেলবে। তাঁর অনুকরণ করতে যেয়ো না, ওতে মারা পড়বে। ঠাকুর-স্বামীজির জীবন-দেখে ও তাঁদের উপদেশ মেনে চললে তোমাদের নিশ্চিত কল্যাণ হবে। জীব-দুঃখে কাতর হয়ে জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁরা দেহ ধারণ করে এসেছিলেন।

সংসারে মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে পড়েছে বলেই ওদের এত দুঃখ-দুর্দশা। মানুষ এখন নিজের ছাড়া অন্য কারুর কথা একবার ভেবেও দেখে না। পরের মঙ্গল না চাইলে আর নিজের মঙ্গল হবে কোত্থেকে? যে দেশের জন্য ভাবে তাকে নিজের জন্য আলাদা করে আর ভাবতে হয় না, দশের সঙ্গে তার নিজেরও ভাগ হয়ে যায়। সে তো আর দশকে বাদ দিয়ে নয়।

সংসারে থাকলে বিয়ে করতে দোষ নেই। কিন্তু বুঝে-শুঝে করবে। সদ্ভাবে জীবন যাপন করার মত শক্তি আগে সঞ্চয় করে নিতে হয়। যেন কোনও অবস্থাতে তাঁকে ভুল না হয়।

সুখী লোক সংসারে নেই একথা কেউ বলতে পারে না। ভগবানকে যে পেয়েছে সে নিশ্চয়ই সুখী। রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আবার বুদ্ধদেব বলেছেন যে, বাসনা-মুক্ত হলেই সুখী হওয়া যায়।

সংসারে লোককে ভালবাসলে খুব সুখী আর মন্দ বললে মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট। সাধারণ সংসারী লোকের ভক্তি তো ঠুনকো কাচের মত, ঘা (আঘাত) দিলেই অমনি ভেঙ্গে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, তাতে যে কতখানি কল্যাণ হয় সে আর সকলে বুঝবে কি করে?

সংসারে ভায়ে-ভায়ে মিল থাকা খুব দরকার। সকলে সমান রোজগার করতে পারে না। হাতের পাঁচ আঙুল

সমান নয়। এ সংসার ক'দিনের জন্য? বেশী ভাববে না। কোন রকমে সংসার চলে যাবেই, তিনি চালিয়ে নেবেন। নিজেকে শুধু নিমিত্ত করে রাখো। তিনিই তো সব করছেন। জীবের সাধ্য কি যে, ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে। তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে জানবে। তা বলে কি কিছু না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? এ সব তমোগুণের লক্ষণ। নিজেকে খাটতে হবে। না খেটে কিছুই লাভ হওয়ার যো নাই। তবে তাঁকে ধরে থেকে কাজ করলে সংসারের দুঃখ-কষ্ট গায়ে লাগে না।

স্বাবলম্বী না হলে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কোন কোন বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ ছেলেদের বলেন—"তোমাদের সামান্য আয়, বুঝে সংসার করবে। আমরা সংসারে থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছি।"

ছেলে-মেয়েদের নিকট বাপ-মা'র খুব সাবধান থাকা উচিত। ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের নকল করে। বাপ-মা মানুষ না হলে ছেলে-মেয়েদের মানুষ হওয়া কঠিন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সময় দেখাবে যেন শত্রু কিন্তু অন্য সময় তাদের স্নেহ করবে।

সংসারে থেকে ভগবানকে ডাকা সোজা। কারণ, যোগান দেওয়ার অনেক লোক থাকে। আর অল্প সাধন-

ভজন করলেই ধর্মবুদ্ধি ও চিত্ত-শুদ্ধি হয়। সংসারীর প্রতি ভগবানের কত দয়া। আগে এদেশে ঘরে ঘরে সাধক ও ভক্ত ছিলেন। এখন আর সে দিন-কাল নেই। বিলিতি শিক্ষা পেয়ে লোক যোগ ভুলে গিয়ে ভোগের দিকে ছুটেছে। ধর্মের উপর সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কোথায়? তাই তো এত দুর্দশা!

তোমরা খুব উঁচু আদর্শ সামনে রেখে সংসার-পথে চলবে, তবে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে। প্রকৃত ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে নিজ নিজ জীবনপথে ঠিক চলতে শেখো। আদর্শ ছেড়ে দিলেই ঠকর খেয়ে ঠিক্‌রে পড়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, পতনের রাস্তা বড়ই ঢালু। একবার পতন হলে কোমর সোজা করে ওঠা খুবই কষ্টকর। তবে মহাপুরুষেরা সংসারী জীবকে তুলবার জন্যই দেহ ধারণ করে আসেন। সংসারীর প্রতি তাঁর কি কম কৃপা?

মায়া

ভগবানের দয়া তো সর্বদাই সব জীবের ওপরে রয়েছে। কিন্তু জীব মায়া-মুগ্ধ, তাঁর দয়া চায় না। ভগবান বিশ্বাত্মা। সকলের মনই তিনি জানেন। যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়। তিনি ধরা দিয়েও ধরা দিতে চান না। এই তো হয়েছে জীবের পক্ষে মুস্কিল। সব ব্যাপারই হচ্ছে তাঁর লীলা। তাঁর লীলার রহস্য সামান্য জীব কি বুঝবে! এক-

মাত্র মহাপুরুষেরাই তা যথাযথ বুঝতে পারেন। আর কারো সুবোদ নেই।

মায়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভগবানের দয়া না হলে সেই মায়ার হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মহামায়া জীবের মায়া-বন্ধন কেটে না দিলে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

এ জগতে সবই মায়া। মায়ার শিকল আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সাধন-ভজন ও অভ্যাসের দ্বারা একটু একটু করে মায়া ত্যাগ করতে হয়। নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ বিচার করে অনিত্য অসৎকে ভুলতে হয়। প্রথমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের মোহ ত্যাগ করতে হয়। বাইরে লোকদের দেখাবে যাতে তারা তোমার মনের ভাব দেখে কিছু বুঝতে না পারে। কর্তব্য বোধে সবই করে যাবে কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড়-লোকের ঝি মনিবের ছেলেদের নিজের ছেলে-মেয়েদের চাইতেও বেশী যত্ন করে মানুষ করে, কিন্তু সে মনে জানে যে তারা তার কেউ নয়।

পারিপার্শ্বিক বা আত্মীয়-স্বজনে মায়া ত্যাগ সোজা। সৎ-অসৎ বিচার আর তীব্র বিবেক থাকলেই ক্রমে ক্রমে হয়ে যায়। কিন্তু বাপু শরীরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয়। দেহ-জ্ঞান রহিত হওয়া কি চারটি কথা? বার বার বিচার করতে হয়, মনে মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হয় যে,

শরীরটাও আমার নয়, মনটাও আমার নয়, ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই আমার নয়। আমার স্বরূপ এরও উর্ধ্বে। এমনি করে সূক্ষ্মের ধ্যান করতে করতে দেহের মায়া যায়, এ সব সময় ও সাধন-সাপেক্ষ। এক দিনে দু'দিনে যায় না। বছরের পর বছর ধৈর্য ধরে বিচার ও বিবেক সহায়ে মায়া ত্যাগ করতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান না হলে মায়াতীত হওয়া যায় না। একটু না একটু দাগ থেকে যায়। তবে তার দ্বারা কাজ হয় না।

এই জগৎকেই কেউ "ধোঁকার টাটি" "কেহ মজার কুটী' দেখছে। আবার কেউ দেখছে এই জগৎটা তার বিরাট দেহ। আমরা সবই তাঁর কোলে রয়েছি, যেমন মায়ের কোলে সন্তান থাকে। আমরা যে তাঁরই সন্তান এইটে ভুল হয়ে যায় বলে যত গণ্ডগোল বাধে। আমরা সকলেই যে মহামায়ার রাজত্বের গণ্ডির ভিতরে। এইটে ভুল হয় কেন? এ যে মহামায়ার এলাকা। তিনি যে কি এক খেলা লাগিয়ে দিয়েছেন—খেলাতেই তাঁর আনন্দ, কত অঘটন ঘটাচ্ছেন!

জীব যতক্ষণ অবিদ্যা অজ্ঞানের এলাকাতে রয়েছে ততক্ষণ তাঁর কাছে এগুতে পথ পায় না, কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাকলে পরেই তাঁর দয়া হলে তিনি কাছে টেনে নেন। জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের খেলাতে মেতে থাকে, তাঁকে কাতরভাবে ডাকবার প্রবৃত্তি হয় না। এই গুণক্ষয়া মায়ার বিচিত্র লীলা!

প্রচারক

আগে নিজের সাধন-সম্মান খুব বাড়াও। ক্রমে যখন আণ্ডিল হয়ে যাবে, তখন তা থেকে লোকের কল্যাণের জন্য যত দান করবে, তোমার ভাণ্ডার ফুরুবে না। কারণ তিনি তখন খুব সাপ্লাই (যোগান) দিতে থাকেন। তা না হলে নিজের কিছু জমতে না জমতে পাত্র-অপাত্র, অধিকারী বিচার না করে কেবল বাজে খরচ করতে থাকলে কি কোন কাজ হয়? নিজের কোন কালে পুঁজি বাড়াতে পারলে না, চিরকাল ভিখারীর মত সাধন-সম্মান-শূন্য হয়ে বেড়াচ্ছে যে, সে আবার ধর্মশিক্ষা দিবে কি?

যে নিজেই মুক্ত হতে পারেনি সে আবার লেকচার দিয়ে অপরের বন্ধন মোচন করে মুক্তি দিতে চায়। এ কি বিড়ম্বনা! নিজে কোথায় পথ্যি করবে তার যোগাড় নেই যে নিজেই কদ্দোলী সে আবার সেই পরম ধন, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ ও পরম শান্তি অন্যকে দিতে চায়! এ কি পাগলামি নয়? যার যা আছে সেই জিনিস সে দান করতে পারে। কিন্তু যা নেই সেই জিনিস সে কি করে দান করবে?

আজ-কাল পরের মুক্তির জন্য ব্যস্তবাগীশ অনেকই হয়েছেন। তাই কোনও ফল হচ্ছে না। যাঁরা লোকশিক্ষা দেবেন তাঁদের সংযম, ত্যাগ ও তপস্যার পুঁজি থাকা চাই। নইলে নিজের কিছুই হল না, কেবল পরের মুক্তির জন্য

ভাবছে। সকলের কি নিত্যানন্দের মত ক্রোধশূন্য, নির্লোভ ও পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়েছে যে, ঘরে ঘরে যাকে-তাকে অভিমানশূন্য হয়ে হরিনাম বিলোবে? সেই অবস্থা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন কাজ হবে না—নকল করতে গেলে মারা যাবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কারুর জন্য মোহ বা আসক্তি রাখবে না। কিন্তু ভগবানের উপর অনুরাগ আসক্তি হওয়া চাই। ভগবানকে ধরলে সবই সত্য আর তাঁকে বাদ দিলে মায়া—মিথ্যা।

জ্ঞানী কাকে বলে? যে কতকগুলো বই ও শাস্ত্র পড়েছে আর কয়েকটা পাশ দিয়েছে তাকেই জ্ঞানী বলে? না। যিনি ভগবানের রাস্তা জানেন ও বলতে পারেন তিনিই জ্ঞানী। তাঁকে না জান্‌লে কি কিছু হয়? গৌতম তাঁকেই জেনে ত বুদ্ধ (জ্ঞানী) হয়েছিলেন। ঠাকুর ছিলেন জ্ঞানী। লেখা-পড়া না শিখেও তিনি কত বড় জ্ঞানী দেখছ ত?

জীবন্মুক্ত হবার পরে জ্ঞানীরা কেবল লোক-কল্যাণের জন্য জগতে থাকেন। নৈলে তাঁদের আর কোন বাসনা নেই। তাঁদের সমস্ত কিছুই লাভ হয়েছে। তাঁদের আর প্রাপ্য অপ্রাপ্য কিছুই নেই। জগৎ তাঁদের কাছে অলীক স্বপ্নের মত। তাঁরা মায়ার পারে গিয়ে মায়াতীত হয়েছেন।

শান্তি মানুষ পেতে পারে যদি সে ভোগকে ছাড়তে পারে। এই ভোগ হতেই যত দুঃখ-কষ্ট রোগ-শোক। যা দুঃখের মূল তাকে আঁকড়ে থাকলে মানুষ কোথেকে শান্তি

পাবে ? স্বয়ং ভগবান এসেও ভোগীকে শান্তি দিতে পারে না—মানুষ ত দূরের কথা।

কারুর কাছে উপকার পেলে তাঁকে কখনও ভুলে যেও না। উপকারের ঋণ কখনও শোধ হয় না। তা যত সামান্যই হোক না কেন। ঋণ শোধ করতে পার আর না পার চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। সব সময় খাঁটি থাকবে।

সব সময় নিজেরই দোষ দেখবে। ভুলেও পরের নিন্দা ও চর্চা করবে না। পরনিন্দা মহাপাপ। ওতে মন ছোট হয়ে যায়, পরের নিন্দা-চর্চা না করে নিজের চর্চা করবে। পর-নিন্দা পর-চর্চা আত্মাকে কলুষিত করে। সব সময় মানুষের গুণটিই দেখবে। দোষ দেখার স্বভাব হলে শুধু দোষই চোখে পড়ে, কারণ দোষে-গুণে মানুষ। ঈশ্বরই নির্দোষ ও গুণময়।

অসুখ বিসুখ, আপদ বিপদ হলে ঈশ্বরে নির্ভর করে কজন থাকতে পারে? সেজন্য ঠাকুরকে স্মরণ করে তার যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করবে। চেষ্টাও তো তিনিই দিয়েছেন। তাঁকে ভেবে করলে নির্ভরতা আসে।

মতের মিল হোক আর নাই হোক তার জন্য মাথা ঘামাতে নেই বা কারুর সঙ্গে সে নিয়ে অযথা তর্ক করতে নেই। তাতে ধর্মভাবের হানি হয়। যে যা ইচ্ছা করুক না তাতে তোমাকে কে বাধা দিতে আসছে ?

ঠিক ঠিক সতী সেই যে নিজের মন জগৎস্বামীর পায়ে সঁপে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ও ছেলেদের মনও

তাঁকে দিতে পেরেছে। মানুষের মন অসতীর মত হয়ে রয়েছে। সতীর যেমন পতিভক্তি ভগবানেও তেমনি ভক্তি। কুন্তীকে সতী বলবে না ত কি বলবে? নিজের মন তো ভগবানে দিয়েছিলেনই, বাকী সব ছেলের মনও ভগবানে দিয়েছিলেন। তাঁরই কল্যাণে ছেলেরা বেঁচে গেল এবং নিজেও বেঁচে গেলেন।

সংসারে মাতা-পিতার মত গুরু আর কেউ নেই। সদ্‌গুরু ইষ্টের পরই তাঁদের স্থান। তাঁদের বাদ দিয়ে ধর্ম ষোল আনা পূর্ণ হয় না। শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, আমাদের ঠাকুর এ সব অবতার-পুরুষদের জীবন দেখলেই বুঝতে পারবে। তাঁদের (মাতা-পিতা) জন্য এঁরা কি-না করেছেন? মার অনুমতি না নিয়ে সন্ন্যাস পর্যন্ত নেননি। ঠিক্ ঠিক্ ধর্মলাভ করতে হলে এঁদের জীবন মান্‌তে হবে।

ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই। কারণ তিনি সবই জানেন। তিনি কোথা দিয়ে কি রকম করে যে ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। ঠিক্ ঠিক্ ভক্তের জীবনে এরূপ অলৌকিক ঘটনা কতই ঘটে থাকে। কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। যারা নামে ভক্ত তারা ভোজনে খুব মজবুত—ভজনে নয়। তাই তারা আত্মার উন্নতি করতে পারে না। হৈ-হৈ করে বৃথা জীবন কাটিয়ে দেয়! যারা ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হতে চায় তারা হৈ-হৈ মোটেই ভালবাসে না। তারা নির্জনে ভগবানকে

ডাকে। ঠাকুর মাঝে মাঝে গাইতেন—"মন, যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে—মাকে তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেহ নাহি দেখে।"

মানুষ আবার কি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নেয় নাকি? এ সব কর্মগত সংস্কার। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—"গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ" কর্মের দ্বারা গুণ আবার গুণের দ্বারা বিভাগ। কর্মই সব—শুভ কর্মের দ্বারা সুসংস্কার হয়। মহাপ্রভু বলেছেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"।

কামনা-বাসনা থেকেই জীবের অভাব বোধ। না হলে জীবের কোনও অভাব নেই। ভগবানে অনুরাগ হলে বাসনা ক্ষয় হয়। তখন অভাব ঘুচে গিয়ে স্বভাব জাগতে থাকে।

কেবল নাম করে চলে যাও—কেন না, কোন শরীরে তাঁর দয়া হবেই—তিনি উদ্ধার করবেনই। এ যে তাঁরই দায়। তাইতো ঠাকুর দুঃখ করে গাইতেন—'এ যে পড়েছি দায়! সে দায় কব আর কায়। যার দায় সেই বুঝে, অন্যে আর কি বুঝবে?'

শ্রীভগবানের দয়াতে যাঁরা জন্মান, সর্বজীবে অসীম দয়া নিয়ে তাঁরা নেমে আসেন। তাঁরা (মহাপুরুষেরা) দয়ার মূর্তিস্বরূপ জানবে। সংসারের মায়া-বদ্ধ জীবকে হুঁশ করিয়ে দিবার জন্য তাঁরা দেহ ধারণ করে এসে উপদেশ দেন। যারা তাঁদের হুকুম মানে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু যারা সব জেনে-শুনেও বিগড়ে থাকে, ডুবে ডুবে জল খায়, তারা কপট।

তারা যেচে লোকের সর্বনাশ করে। তাদের জীবনটা বৃথা হয়ে যায়।

মনুষ্য-জীবন ধারণ সার্থক হবে যখন বারবার জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠবে, আর বলবে, 'হে ভগবান, আমায় বাঁচাও, তোমার দয়া বিনা আর বাঁচি না'।

যে তাঁর (ঠাকুরের) হুকুম পালন করবে সংসারের শক্তে তুফান তরঙ্গে আপদ বিপদে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। তাঁরই সব খাচ্ছে, তাঁরই পরছে অথচ তাঁর হুকুম মানে না। এসব বেইমানী বৈ কী? তাঁকে না মানলে কি ধর্ম হয়? যে পৃথিবীর জন্মদাতা ও বাপমাকে মানে না সে 'চোর'। তার দ্বারা কি কখনও ধর্মলাভ হয়, না দেশের কল্যাণ সাধিত হয়?

মানুষের কাছে ফাঁকি দিয়ে চলা সোজা, কিন্তু ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। লোকের কাছে যত ভালই সাজো না কেন, তোমার কি গলদ, তোমার চেয়েও তিনি ভাল জানেন। সেজন্য ঈশ্বরের কাছে অকপটভাবে প্রাণ খুলে প্রার্থনা করতে হয়—হে প্রভু, আমার সব দোষ তুমি দূর করে দাও। যতই এগোও না কেন একটু না একটু দোষ থাকবেই। ভগবানকে না পাওয়া পর্যন্ত কখনও নির্দোষ হওয়া যায় না।

হিংসাই বিষ। একটু মাছ মাংস খেলে আর কি হবে?

ওটা ত লোকাচার। আসল হিংসা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরের ভালটা সহ্য হয় না—অন্যের ভাল বা উন্নতি দেখে চোখ ফেটে যায়। যদি হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ছাড়তে পার, তবে ভগবানকে বুঝতে পারবে।

আজকাল সকলেই leader (নেতা) হতে চায়। দেশের সেবা করতে কোমর বাঁধে। আরে যাদের দয়াতে এই পৃথিবী দেখলে সেই বাপমার সেবাই প্রাণ দিয়ে ভালবেসে করতে পারলে না। সে আবার দেশের সেবা কি করবে? হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়। ব্যাপার বোঝ। যার ব্রহ্মচর্য নেই, সেই পরম বস্তু ভগবান লাভ হয়নি সে আবার হাম্বাড়া 'লিডার' সেজে দেশের ও দশের কল্যাণ করবে! আরে নিজের বাপমার অসুখ হলে সেবা করতে পারে না, সে আবার দেশের সেবা করবে কি? যে নিজেরই কল্যাণের পথ চেনে না, সে আবার কি দেশের কল্যাণ করতে পারে? এরকম 'লিডার' হুজুকে পড়ে প্রথমে লোকের বাহবা পেলেও শেষে লোক হাসাবে বৈ তো নয়, যখন লোক তার সাচ্চা (আসল) রূপ বুঝতে পারবে। তাই স্বামীজী বলতেন—ওরে 'লিডার' জন্মায়, টেনে-টুনে কি 'লিডার' করা যায়?

স্বার্থ, মান-যশের কাঙ্গাল—এ রকম কাঙ্গালের দ্বারা কি কখনও বড় কাজ হতে পারে? দেশের জন্য ভেবে ভেবে পাগলপারা হলে তবে ভগবানের দয়া লাভ হবে। এখন

তাঁর ইঙ্গিতে কাজে নামলে ঠিক্ ঠিক্ কল্যাণ করতে পারবে। শুধু শুধু চেঁচামিচি লেক্‌চার করা বৃথা, তাতে কি কল্যাণ হয় রে? আরে হিংসা ছাড়তে না পারলে দেশের উপর ভালবাসা হবে কেমন করে?

ভগবান পবিত্র হৃদয় দেখে তবে তাঁর কাজ করবার শক্তি দেন। তাঁর হুকুম পেয়ে সে কাজ করে ধন্য হয়, এবং তার কাজই ঠিক্ ঠিক্ কাজ হয়। স্বামীজীর জীবন তার সাক্ষী। তিনি কত তপস্যা করেছেন! তবে তাঁর হুকুম পেয়ে কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কত কাজ করে গেলেন তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। কার দ্বারা কি করাতে হবে তা ভগবানই বুঝেন। তাঁর জগতে তিনিই ভাল বুঝেন, তুমি আমি কি বুঝতে পারি? যে বিষয় বুঝি না তা নিয়ে হৈ-চৈ করার কি দরকার? চুপ করে থাকাই ভাল। যে ঠিক্ ঠিক্ কর্মী সে ভগবানের দয়ায় তাঁর কাজ করতে হুকুম পাবে। তার দ্বারা তিনিই কাজ করিয়ে নেন। যেমন স্বামীজীর দ্বারা তিনি করিয়ে নিলেন তবে তাঁকে ছাড়লেন। যে এই ব্যাপার বুঝে সে আর হৈ-চৈ করে না—সে জীবন্মুক্ত হয়ে গেছে। এই জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই তাঁর কাজ ঠিক্ ঠিক্ করতে পারেন।

অমাবস্যার রাতে কোলের মানুষ যেমন চেনা যায় না তেমনি মোহ-অন্ধকারে জীব এরূপ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে সে নিজেকে চিনতে পারে না। মোহকূপ হতে তুলে জীবকে

তার আসল রূপ চিনিয়ে দিবার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। এ দায় তাঁরই। তাইতো ঠাকুর মাঝে মাঝে গাইতেন—'এ যে ঠেকেছি যে দায় কব কায়।' জীবোদ্ধারের জন্য ভগবান আবার কখনও কখনও শক্তিশালী মহাপুরুষ ও আচার্যগণকে পাঠান। যদি বল ভগবান ইচ্ছা করলেই তো জীবকে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত করে দিতে পারেন, তবে আবার দেহ ধারণ করেন কেন? এসব 'কেন'র উত্তর জীব কি দিবে?

তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময় ও মঙ্গলময়—তাঁর ব্যাপার কে বলতে পারে? তিনি দুনিয়ার মালিক, তাঁর খুশীমত কাজ করেন। জীব কি তাঁর তত্ত্ব সব জানতে পারে? তিনি খুশী হয়ে যতটুকু জানিয়ে দেন ততটুকুই ভাল; তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মায়ার অধীন জীব আবার তাঁর কাজের হেতু খুঁজতে যায়। ও-সব পাগলামি ভাল নয়। তাঁর শরণাপন্ন হও, তাঁর দয়া-ভিখারী হও। তাঁর দয়া পাবে এবং এ মায়া থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে।

সেই অতি সূক্ষ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপকে আমরা ধারণা করতে পারি না বলে স্থূল প্রতিমা অবলম্বন করা ভিন্ন ভগবদ্ সাক্ষাৎকারের উপায় নেই। কেবল শাস্ত্র পড়ে বা শুনে যদি ভগবদ্তত্ত্ব বোঝা যেতো, তাহলে জগতে ধর্ম সম্বন্ধে এত ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতো না। ইহা বোঝাবার সামগ্রী নয়। যাঁর হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে তিনি ভিন্ন অন্য

কারোর ভগবদ্‌তত্ত্ব বোঝবার সাধ্য নেই। যাঁদের শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, তাঁদের অধিকারই নেই। যাঁর দেবতাতে ও গুরুতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাঁর নিকটে তত্ত্বকথা বললে তিনি তার মর্ম বুঝতে পারবেন, অন্যে নয়। আরশি যদি মলিন হয়ে থাকে, তাহলে মুখ দেখা যায় না। যাদের চিত্তশুদ্ধি হয়ে শ্রদ্ধা জন্মেছে, কেবল তাদের নিকট শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যের নিকট নয়।

জড়ভরতের ঠিক্ ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 'আমি শুদ্ধ আত্মা'। রাজা রুহুগণ তাঁর মুখ হতে আত্মজ্ঞানের কথা শুনে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' তখন জড়ভরত বললেন, 'আমি শুদ্ধ আত্মা'। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান করি, কেবল মুখে 'নেতি নেতি' বলি, এই রকম বলার নাম ব্রহ্মজ্ঞান নয়। ব্রহ্ম জীব নয়, জগৎ নয় এইরূপ বিচার করতে করতে যখন তাঁতে মনের লয় হয়ে গিয়ে সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

আমরা কি কেবল গাছ, পাথর পূজা করি? আমরা এই বলে প্রণাম করি যিনি সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণুতে পরমাণুতে রয়েছেন তাঁকেই উদ্দেশ করে আমরা প্রণাম করি। এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে—পশু-পক্ষী লতা-পাতা নদ-নদী পর্বতকে—প্রণাম করতে পারলে তার নাম ব্রহ্ম-জ্ঞান। তিনিই বৃক্ষ লতা নদ নদী পাহাড় পর্বত চন্দ্র সূর্য গ্রহ

নক্ষত্র তারকাদি সব হয়েছেন। তিনিই আপনি উপাস্য হয়েছেন আবার তিনি উপাসক হয়েছেন।

নিরাকার অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, উচ্চ অবস্থা না হলে সাধারণ লোকের ধারণায় আসে না। সন্দেশ খেয়ে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দটা নিরাকার, কিন্তু ছানা চিনি মেশান সাকার সন্দেশকে অবলম্বন না করে যদি সেই আনন্দটা অনুভব করতে পারা যেতো তাহলে সন্দেশ খেতে কেউ চাইতো না। আমরা সেই অসীম, অনন্ত, চিৎস্বরূপকে কিরূপ ধারণা করতে পারবো? সৎ-চিৎ-আনন্দকে অনুভব করতে হলে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে ধরতে হবেই। প্রত্যেক লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় তিনি যে রয়েছেন এইটুকু শেখবার জন্যই আমাদের বৃক্ষ লতা নদী পর্বত অগ্নি প্রভৃতিকে প্রণাম অভ্যাস করা দরকার।

বৃক্ষ লতা পাতা নদী পর্বত চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সব শুনতে পায়, জানতে পারে, কারণ তিনি যে সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়ে রয়েছেন, সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে জানেন। তিনি বৃক্ষে লতায়, নদী পর্বতে, পশু পক্ষীতে, চন্দ্র সূর্যতে যদি থাকেন, তাহলে সর্বদর্শী তিনি সবই তো দেখতে পাচ্ছেন, জানতে পাচ্ছেন। গীতায় ভগবান স্পষ্টই বলেছেন, "আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না"। ভগবানকে কেবল একটা মন্দিরের ভেতরে

দেখবে কি? তিনি যে প্রত্যেক স্থানে রয়েছেন, তিনি ছাড়া কি কোন পদার্থ বা কোন স্থান আছে?

সকল পদার্থে সেই ভগবান আছেন। সকল পদার্থকে ছেড়ে দিলে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। একজন জানতো না তাই বাঁধাকপির পাতার পর পাতা খুলে ভেতরে সার জিনিস কিছু দেখতে না পাওয়াতে সব ফেলে দিয়েছিল। এই কথা শুনে তার মনিব তাকে বললেন, "করেছো কি? তুমি কি জানতে না যে তার পাতায় পাতায় কপি, পাতাই যদি সব ফেলে দিলে তবে আস্বাদন করবে কি?" এই বলে তিনি সেই পাতাগুলি নিয়ে রন্ধন করে তাকে কপির তরকারি আস্বাদন করতে দিয়ে বললেন, "যাকে তুমি অপদার্থ বলে ফেলে দিয়েছিলে আমি তাই থেকে মিষ্টি আস্বাদন বার করতে পেরেছি"। অতএব যে সাধক অগ্রাহ্য করে কোনো পদার্থ ফেলে দেন না, তিনি সাধন দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। ভগবানকে দর্শন করবার যে ইন্দ্রিয় আছে সেই জ্ঞানচক্ষু ফুটলে সাধক তত্ত্বদর্শী হতে পারবেন। সকলই সময়ের অপেক্ষা করে। কুঁড়ি হতে ফুটে ফুটে বেরুতে অনেক দিন লাগে। জগতে যা কিছু সবই ব্রহ্ম এইটে ভগবদ্ কৃপায় যাঁর পাকা ধারণা হয়ে যায়, তাঁরই ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই আসল জ্ঞান, আর যা কিছু জ্ঞান সবই বিষয়গোচর জ্ঞান।

যে মন চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, সেই চঞ্চল মনকে স্থির

করবার জন্ত একটি অবলম্বন না করলে আমরা পারি না। সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ যাঁকে ধরে সেই প্রতিমা—যিনি প্রতিমা হয়ে আছেন—তাঁকে আমাদের উপাসনা করতে হবেই। একজনের প্রবৃত্তি আছে একদিকে, তাকে নিজের দিকে বা অন্ত কোনো দিকে টেনে নিয়ে যাবে না, এইজন্ত নানারকম দেব-দেবীর প্রতিমা হয়েছে। যাঁর যে অভীষ্ট দেবতা, যিনি যে মূর্তিকে ভালবাসেন, তাঁকেই অবলম্বন করে ধ্যান করতে হবে। যিনি যা ভালবাসেন, যাঁর স্বরূপ হৃদয়ের ভাব, ভগবান তাঁর নিকটে সেইরূপ। ভগবান এক ভিন্ন দুই নেই, ইহা সত্য, তবে যিনি যা চান, তাঁর কাছে তিনি তাই, এইজন্ত অত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মূর্তি হয়েছে।

আকার ভিন্ন সাধন হবার জো নেই। লাল রং ভাবতে গেলে জবা ফুল, সিন্দুরে মেঘ প্রভৃতি কোনো একটা স্থূল জিনিস ধারণা করতে হয়। যাঁরা সাধন করবেন তাঁদের প্রতিমা চাই। মহাদেবের রূপ, জ্ঞানের রূপ—ভস্ম ও চন্দন তুল্য, পট্টবস্ত্র ও বাঘছাল সমান। সেই সূক্ষ্ম জ্ঞান জিনিসকে ঘন করে রূপ গড়লে মহাদেবের রূপ হয়, সেই জ্ঞানের মূর্তি মহাদেবকে ধ্যান করলে তিনি প্রসন্ন হলে তবে তাঁর তত্ত্ব ঠিক বুঝতে পারবে।

মনুষ্যরূপী গুরুকে সামনে রেখে যদি সেই গুরুর রূপ গুণ ধ্যান করা যায়, তাহলে গুরুর হৃদয়ের ভাব শিষ্যের হৃদয়েতে সঞ্চারিত হবে। সাধু মহাপুরুষকে সর্বদা ভাবলে হৃদয়

সাধু—পবিত্র হয়ে যাবে, চোরকে ভাবতে থাকলে ক্রমে চোর হয়ে যাবে। সর্বদা সৎসঙ্গ করতে করতে সৎ ভাবেতে হৃদয়টা গঠিত হয়ে যাবে।

একলব্য ব্যাধ দ্রোণাচার্যের নিকট বাণ শিক্ষা করতে গিয়ে যখন হতাশ হয়ে ফিরে এলেন, তখন তিনি মাটির দ্রোণাচার্য গড়ে সেই প্রতিমাকে সম্মুখে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিলেন। এ যোগমার্গ—তিনি ঐ গুরুর শক্তিতে নিজের শক্তিকে গড়ে ফেললেন। একটা কুকুরের মুখে সাতটা বাণ বিদ্ধ দেখে অর্জুন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দ্রোণাচার্যকে গিয়ে বলাতে, তিনি অনুসন্ধান করতে করতে একলব্যের নিকট গেলেন। তখন একলব্য সাক্ষাৎ গুরু দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে বললেন, "ঐ আপনার প্রতিমা সামনে রেখে আমি সাধনা করে এই বাণবিদ্যা শিক্ষা করেছি"। অতএব এই প্রতিমা পূজা ঠিক্ ঠিক্ করলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য হৃদয়কে শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার জন্য একটি অসুরনাশিনী শক্তির প্রয়োজন হওয়াতে দশভুজা দুর্গার প্রতিমা পূজা করেছিলেন। আপনি সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তবে তিনি রাবণ বধ করতে পেরেছিলেন।

ভগবান অরূপ হলেও তোমার আমার হৃদয়ের ভাবের অনুরূপ নিয়ে তাঁর রূপ হয়। সৎ-চিৎ-আনন্দ আমাদের

হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে বলে আমরা কোনো একটি আনন্দঘন বিগ্রহের ধ্যান করতে পারি। মন প্রাণ ঐক্য করে যে যা চাইছে, সেই ভক্তের নিকটে ভগবান সেই রকম রূপ ধারণ করে আসেন। কোনো রকম কায়িক পরিশ্রম করে যদি ঈশ্বরকে পেতে হয় তাহলে ঈশ্বর জড় পদার্থ। তিনি যদি সৎ-চিৎ-আনন্দ হন, তাহলে তিনি মনের ভাব সব বোঝেন। ভগবানকে যা বলে ডাকবে, তাইতেই তিনি বুঝতে পারেন। প্রতিমার সামনে ভক্তির সহিত কাঁদতে পারলে প্রতিমা হৃদয়ের ভাব জানতে পারেন, এমন কি কথা কয়েও থাকেন। তিনি যে প্রত্যক্ষ রয়েছেন, কেবল প্রতিমার ভেতর থেকে প্রাণের কান্না কেঁদে তাঁকে বাহির করতে পারলেই হয়। আমাদের ঠাকুর সাধন শক্তিলাভ করে দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রতিমার ভেতরে ভগবানকে জাগ্রত দেখতেন, কত কথাই কইতেন, কখন কখন প্রতিমাদর্শন করতে করতে ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। যাঁর শক্তিতে আমাদের হাড়মাসের এই চঞ্চল প্রতিমা কথা কইছে, সেই ভগবানের শক্তি বৃক্ষ-লতাদিতে এবং প্রতিমাতেও রয়েছে। অবিশ্বাসী ও সংশয়-চিত্ত যাঁরা, অনেক পড়ে শুনেও অভিমানের গাঁট পেরোতে পারেননি, তাঁদের এসব নজির দেখেও ধাঁধা লাগে, বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। তাঁরা চিরকাল মনের রোগ পুষে রেখেছেন। সংশয়ের অন্ধকারে থাকতে তাঁরা ভালবাসেন তবু বিশ্বাসের আলোকে এসে প্রাণ জুড়ুতে চান না। এইজন্য সংস্কার

মানতে হয়। পূর্ব জন্মের সুকৃতি না থাকলে কারোর কি ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস সহজে হয়? এই সব দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মালে তার চট্ করে মনের সংশয় ঘুচে যায়। অর্জুন দৈবী সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে শীগ্‌গীর তাঁর মোহ কেটে গেল, আত্মজ্ঞান লাভ করে তিনি বেঁচে গেলেন।

প্রতিমা পূজার ভেতরে প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বড় ভালবাসতেন, তাঁর সীতাগত প্রাণ ছিল, তাই যজ্ঞ করবার সময় সোনার সীতা তৈরী করে সেই প্রতিমাকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে নিয়ে পাশে সিংহাসনে বসিয়ে যজ্ঞকার্য করেছিলেন। এই কথা যখন সীতা শুনলেন তখন তিনি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে দিনযাপন করছিলেন। সেই সময়ে সীতাদেবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, যেন জন্মে জন্মে রামের মত পতি পাই।

যত প্রকার ভজনসাধন আছে, ভগবানকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করবার একমাত্র প্রথম উপায় প্রতিমা পূজা। ভগবান অন্তর্যামী, তিনি জানছেন যে আমাকে দেখতে পায় না বলে ভক্ত প্রতিমা নির্মাণ করে ভক্তিভরে নানারকম নৈবেদ্য দ্বারা আমার পূজা করে থাকে। এতে যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, এই কথা যিনি বলেন, সেই সংশয়-চিত্ত ব্যক্তি ভগবান মানেন না। শুধু পড়ে শুনে তো সংশয় ঘোচে না। সাধুসঙ্গ না করলে শুদ্ধজ্ঞান কোথায় পাবে? জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল-

ভাবে ভগবানকে ডাকলে তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যাবে। বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদের দিব্যজ্ঞান কোথা হতে হয়েছিল? তাঁরা তো কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, জ্ঞানের চূড়ামণি ছিলেন।

যেমন অনেক ডাক্তার রোগীর রোগ ধরতে না পেরে আন্দাজী ঢিল ছুঁড়ে ত্যাখে, যদি লেগে যায়, তেমনি সংসারে ভবরোগটা কি অনেকই ঠাওরাতে পারে না। যে মনে কিছুই ভাল লাগে না, ভোগের জিনিস পাবার জন্য সর্বদাই অস্থির হয়ে থাকে, যখন তা পায় ক্ষণকালের জন্যে কিছু তৃপ্তিবোধ করে, আবার না পেলে একটা অস্বস্তি বোধ—এই সব হচ্ছে মনের রোগের লক্ষণ।

ঠাকুর দেবতা যা কিছু মানুষ উপাসনা করে থাকে সকলেরই ভেতরে সেই চৈতন্য—আত্মা রয়েছেন, যাঁকে জানলে মানুষের মনের রোগ—সব দুঃখ দূর হয়। আত্মজ্ঞানের কথা শুধু পড়লে শুনলে কাজ হয় না। যাঁর হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে, তাঁকে আত্মার কথা প্রথমে শ্রবণ করে সর্বদা মনন করতে হবে, তার পরে সেই চৈতন্যের ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। এই রকমে আত্মার সাধনা করলে তবে সেই চৈতন্যকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারবে। আমার সাধনা করবার শক্তি নেই, এই রকম কাঁদুনি যে সব অজ্ঞানীরা গায়, তারাই আবার স্ত্রী পুত্র ও নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিনরাত চিন্তা করছে এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। পরমার্থের চিন্তা—

নিজের আত্মার উন্নতির চিন্তা একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে যারা কেবল বিষয়-সুখ ভোগের জন্য, অর্থের জন্য ন্যায় পথেই হোক বা পরের অনিষ্ট করেই হোক জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে, তারাই তো আত্মঘাতী—নিজেই নিজের শত্রু।

যাঁকে জানলে সব অভাব—হাহাকার চিরকালের জন্য ঘুচে যায়, সেই তাঁর দিকে তো জীবের লক্ষ্য নেই। নিজেকে দুর্বল ভেবে অল্প সুখের আশায় চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ান তো অজ্ঞানের কাজ। আত্মার কোনো অভাব নেই, তিনি পূর্ণ। অজ্ঞান কখনো আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তিনি চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সদা আনন্দময়। যদি সব দুঃখের হাত এড়াতে চাও, তবে এইটে পাকা ধারণা করবার জন্য সর্বদাই মনন করতে থাক যে তুমি জড় নও—তুমি চেতন, তুমি দেহ নও, তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার অংশ। তিনি অগ্নিরাশি, জীব স্ফুলিঙ্গ, অগ্নির কণা।

আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম যে আত্মা—সেই বস্তুকে ধ্যান করতে হলে কোনো একটি অবলম্বন চাই। অবলম্বন ভিন্ন নিরাকার ধ্যান করা কঠিন, সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, যাঁরা দেহাভিমানী, তাঁদের পক্ষে ভগবানের নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা, সেই অব্যক্তে মন লাগান বড় কষ্টকর। যতক্ষণ দেহে 'আমি' বলে অভিমান আছে, ততক্ষণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের এলাকার মধ্যে থাকতে হবে। এই

তিনগুণের অতীত অবস্থা না হলে ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ হয় না, সেই পরমাত্মায় মিশে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জ্ঞানরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা পবিত্র হলে সেই পরমাত্মাকে জানা যায়, তখন ব্রহ্মভাব লাভ হয়। তাঁকে পেলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে যে সূক্ষ্ম চৈতন্য রয়েছেন, যাঁতে কোনো বিকার নেই, সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই তিনগুণের সংস্রব নেই, এমন যে নির্গুণ, নির্বিকার চৈতন্যের ভাব দেহাভিমানী জীবের ধ্যান ধারণার অতীত। সেই মহাচৈতন্যের যে গুণযুক্ত ভাব—যে অবস্থায় ঐ তিনগুণের প্রকাশ হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাঁর সগুণ অবস্থা। তিনিই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন, সুতরাং সগুণভাবে তিনি জগতের ঈশ্বর, আবার তিনিই মহাশক্তি জগদীশ্বরী, অতএব তিনি—সেই বিশ্বরূপী ভগবানই—জীবের একমাত্র উপাস্য, ধ্যান-ধারণার বস্তু, তাঁকে পেলে জীব অমৃতের আস্বাদন পাবে, অমর হয়ে যাবে।

কাশীতে জনৈক সাধুকে বলেছিলেন, "হৈ-চৈ ত অনেক করলে এখন দিনকতক সাধন ভজন কর দেখি। কাশীতে কোনো আশ্রমে দুই বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি টাকা দেব, তুমি দুধ খাবে।"

তিনি নির্জনে সাধন-ভজনের কথা খুব বলতেন। দিন কতক সকল সাধুরই নির্জনে সাধন-ভজন করা উচিত। তাঁর

নাম করে বেরিয়ে পড়, তিনি সব সুবিধা করে দেবেন। তোদের ঐ দুর্বলতা, কোথায় থাকবো, কি খাবো! উদ্দেশ্য ভুললে চলবে না। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাধু হতে আসে বটে; কিন্তু মান সম্ভ্রমে সব ভুলে যায়।

বিয়ের কত ফ্যাসাদ জানি না? আজকালকার দিনে সমস্তদিন খেটেও ভাল খাওয়া, ভাল পরার ব্যবস্থা করতেই ত লোকের প্রাণ যায় যায় হয়েছে—তার উপর যদি স্ত্রী একটু হেসে তোর ভাগ্নে বা তোর ভায়ের সঙ্গে একটু কথা কয়েছে, তা হলেই সন্দেহের ভারে তোর বুক ভরে গেল। বুকের যন্ত্রণায় তোর প্রাণ আই ঢাই করতে লাগলো। এই তো বিয়ের সুখ।

ভয় কচ্ছো কেন? যাঁকে ধ্যান করবে তাঁকে ভয় কচ্ছো কেন?

ভগবান তো সবই কচ্ছেন তবে আর মানুষকে মানি কেন? তা কি হয় রে? উপলক্ষ্য মানতেই হবে। ভগবান যাকে নিয়ে সৎকাজ করান তাকে মানতেই হবে। সে মান্য পাবেই পাবে। দেখনা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে গীতা হোলো। সকলেই অর্জুনকে মানলে, আর দুর্যোধন আজও গালি খাচ্ছে।

মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া লাটু মহারাজ বলিতেন —"কি জন্য সন্ন্যাসী হয়েছ এইটা কখন ভুলো না। যে তাঁর (ঠাকুরের) কথা মেনে চলবে, তারই কল্যাণ হবে। সাধন পথে

খুব এগিয়ে পড়; শুধু লাল কাপড় পরে সাধু সেজে বেড়ালে বড় জোর লোকমান্য হবে, কিন্তু তাতে আত্মবঞ্চনা করা হবে। গোলমালের মধ্যে পড়ে থাকে বলে অনেকেই সাধন-পথে হু হু করে এগুতে পারে না, কিছুদিন নির্জনে থেকে খুব কঠোর করতে পারলে তবে বস্তুলাভ হতে পারে। ঠিক যাঁর বস্তুলাভ হয়েছে এমন সাধুর প্রধান লক্ষ হচ্ছে—তিনি অদোষদর্শী, অক্রোধী, সর্বজীবে প্রেমপূর্ণ হন। গীতায় ভগবান বলেছেন—যে সাধু সর্বভূতে বাসুদেব দেখতে পান এমন মহাত্মা জগতে বড় দুর্লভ। যে দিন তা পারবে তখন লাল কাপড় পরা সার্থক হবে, নচেৎ বিড়ম্বনা মাত্র।

সাপের ল্যাজে পা পড়লে যেমন সে ফোঁস করে ওঠে, তেমনি কাঁচা সাধুকে কেউ একটা ছোট বড় কথা বললে সে রাগে গরগর করতে থাকে, হয়তো রাগ সামলাতে না পেরে দু'টো গাল দিয়ে ফেলে। কিন্তু যে পাকা সাধু তার মনকে কিছুতেই টলাতে পারে না, পাহাড়ের মত অচল অটল থাকে। তার যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়েছে যে তিনিই ভগবান, এই সব সেজে খেলা করছেন, কাউকে হাসাচ্ছেন, কাউকে কাঁদাচ্ছেন। নিন্দা স্তুতি, গালিগালাজ, যা কিছু বল সবই তাঁর খেলা বই ত আর কিছু নয়। এই রহস্যটা বুঝতে পারলে আর কোনো ঝগড়া থাকে না। তখন লোকের নিন্দা স্তুতি সমান জ্ঞান হয়। গীতায় এ কথা আছে। গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাস নিলেই মহাপুরুষ বনে' যায়

না। সন্ন্যাসের সময় ঐ কটা প্রতিজ্ঞা বাক্য বললেই কাম, ক্রোধ, লোভ পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। কতকাল সাধন-ভজন করতে করতে তবে সব দমন হয়, তখন পবিত্র অবস্থা হয়ে যায়। নানা রকম সংস্কার নিয়ে মানুষ জন্মায়। যাঁরা অবতার-মহাপুরুষ কিছুদিন তপস্যা করলেই তাঁদের মানুষ দেহের সংস্কার সব ভেগে যায়। সাধারণ মানুষের অনেক কঠোর তপস্যা করতে হয়। তবে ঐ সংস্কার ক্রমে ক্রমে দূর হয়। যেমন এক সের খাঁটি দুধে যদি দু সের জল ভেজাল থাকে,—তাকে অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে হয়, তবে ঘন হয়; ঘন হলে তখন তা দিয়ে পুতুল তৈরী হতে পারে। কিন্তু ধৈর্য ধরে জ্বাল দিতে হয়। তবে হয়। কিন্তু যে দুধ খাঁটি তা শীঘ্রই ক্ষীর হয়ে যায়—অত কষ্ট করতে হয় না।

জীবন্মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের কাজ করতে আসেন, ও-কথা ঠাকুর বলতেন। তাঁরা ভগবানের জমিদারি রক্ষা করতে আসেন।

শ্রীগুরু যদি জীবনতরীতে হাল ধরে বসেন, তা কখনই ডুববে না, অনেক ঝড় ঝাপটাতে পড়লেও এ অকূল পাথারে সে তরী একদিন কিনারা পাবেই।

৺কাশীতে জনৈক ভট্টাচার্য মহাশয়ের ছেলের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে বিহ্বল হইয়া লাটু মহারাজের নিকট আসিয়াছেন। মহারাজ সব শুনিয়া বলিলেন, "বিপদ কিছু নয়! ছেলে কি আপনার? এই মায়ার সংসারে চির-

কালই এরূপ হয়ে থাকে। জন্ম হলেই মৃত্যু হবে, আবার মৃত্যু হলে জন্ম হয়। একি আপনার ছেলে? আপনার বলে কি আছে বলুন তো? সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান দরকার। শোকে কেন কাতর হবেন? শরীর কি চিরদিন থাকে? মৃত্যু ত হবেই। কেন আপনি অধীর হচ্ছেন?"

মহারাজের এই কথা শুধু শুষ্ক উপদেশ মাত্র ছিল না। নিজের সুগভীর আধ্যাত্মিক উৎসধারা হইতে প্রবাহিত হইত বলিয়া পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের হৃদয়ে তাহা প্রকৃত শান্তি আনিয়া দিয়াছিল।

*　　*　　*

লাটু মহারাজের অসুস্থ অবস্থায় এক ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ আপনি তো ইচ্ছা করলেই মনের শক্তিতে নিজের ব্যাধি আরোগ্য করতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "ভোগ শেষ না হলে আমার মুক্তি হবে না, কর্মভোগ শেষ না হলে আবার জন্ম। কর্ম অনুসারে শরীরের যা ভোগ আছে হয়ে যাক, সুখ দুঃখ ত এই শরীরের।"

*　　*　　*

ত্রৈলোক্য নামে একটি ছেলে সাধু হইতে মঠে গিয়াছিল। অনুপযুক্ততার জন্য তাহাকে রাখা হইল না; লাটু মহারাজ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। প্রথমে ছেলেটি ভালই ছিল। শেষে তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন

হইতে লাগিল। সে স্বেচ্ছায় অন্যপথে চলিয়া গেল। তখন আমরা লাটু মহারাজের স্নেহ ও ভালবাসা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। ছেলেটিকে বার বার বুঝাইতেছিলেন "ওরে তুই থাক, তুই থাক, থাকলে তোর ভাল হবে।" সে কি স্নেহমাখা স্বর, তাহা যে শুনিয়াছে তাহারই মনে গাঁথা রহিয়াছে। কিন্তু ছেলেটির প্রবল প্রারব্ধ। সে মহারাজের কথা শুনিল না। একটি ছেলে সাধু হইয়া শ্রীভগবানের নামে জীবন কাটাইবে ইহার জন্য সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অপার্থিব ব্যাকুলতা দেখিয়া সত্যই সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

লাটু মহারাজ সেদিন বলিয়াছিলেন, "ওরে ছাখ, একটি ছেলে সাধু হবে এ যেন মহামায়ার রাজত্বে অসহ্য। ছেলে মরে যায় সেও ভাল। সাধু হবে, পবিত্র হবে, এ অবিদ্যা মায়া সব সময় বাধা দেয়।"

* * *

জনৈক ভক্ত অফিসে সাধারণ কাজ করেন। তাঁহার সন্তান আছে দু'তিনটি। লাটু মহারাজের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "আর কেন? অল্প মাইনে। বেশী ছেলেমেয়ে হলে জড়িয়ে পড়বে। সংযমী হও। রাত্রে এইখানেই শোবে। এখানেই থাক।" এই ভক্তটি বহুদিন লাটু মহারাজের সঙ্গ করিয়াছিলেন।

* * *

লাটু মহারাজ শ্রাদ্ধাদি খুঁটিনাটি কার্য মানিয়া

চলিতেন। কোন ভক্ত কাশীধামে আসিলে গয়াধামে মৃত পিতামাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দানের আবশ্যকতা খুব জোর দিয়া বলিতেন। কেহ এ বিষয়ে আপত্তি করিলে বলিতেন, তোমরা বুঝি "মরা গরু ঘাস খায় না" ভাব? না তা নয়, কিছুতেই নয়। এসব আছে। এসব সত্য। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে সত্যই মৃতের সদ্‌গতি হয়। আর ওখান (গয়াধাম) থেকেই তো ঠাকুরের উৎপত্তি। ওস্থানের মাহাত্ম্য আছে বই কি!"

* * *

একবার জনৈক ভদ্রলোকের মাতাঠাকুরানী দুর্ঘটনায় মারা যান। গয়াধামে তাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের জন্য লাটু মহারাজ নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুর শ্রাদ্ধাদি কর্মে উপস্থিত থাকা ভাল নয়। সাধুর এসব কাজের সময় থাকতে নেই।"

* * *

রামরাজাতলার শঙ্কর মঠের মোহান্ত একবার লাটু মহারাজের দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ তখন কাশী-ধামে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে তাঁহার মঠের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, তাঁর ইচ্ছায় ভাল ভাবেই চল্‌ছে। আমি আর কি? তিনিই তো সব।" তখন উক্ত সন্ন্যাসীর সুনাম

বাহির হইয়াছিল এবং শঙ্কর মঠের বেশ খ্যাতি হইয়াছিল। লাটু মহারাজ তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এ কি? তোমার এই দীনহীনভাব কেন? আমি জানি করনেওয়ালা তিনি। কিন্তু এই ভাব ভিতরে রাখাই ভাল। বলতে হবে বই কি যে এবাড়ী আমার, এসব আমার। এই যে আমি এই বাড়ীভাড়া করে আছি তা কি বলব না? বলব বই কি। ওভাব ভিতরে থাক যে তিনিই সব।" পরে তাঁহাকে বলিলেন, "কাল এখানে তুমি খাবে, আমি কিন্তু মাছ খাই। তুমি আমার সঙ্গে খাবে ত?" সন্ন্যাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "খাবো।" পর দিন বহু যত্ন করিয়া তাঁহাকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইয়াছিলেন এবং নিজে তাঁহার পাশে বসিয়া মাছ খাইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ প্রত্যহই যে মাছ খাইতেন এমন নহে। কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীর ভাব পরিবর্তনের জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন।

*　　　*　　　*

কাশীধামে অনাদি শিব তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করিবার কথা আমাদের প্রায়ই বলিতেন। ওখানে যে সকল সন্ন্যাসী বিগ্রহের সেবাদি করেন, তাঁহাদের বড়ই কষ্ট। একবার ওখানকার জনৈক সাধু প্রসাদ দিতে আসেন। তাঁহার খুব সর্দি হইয়াছিল। লাটু মহারাজ তাঁহাকে চা খাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, চা খেয়ে কি হবে? ভোর চারটায় উঠে গঙ্গাস্নান করে প্রভুর পূজো করতে ত

হবে? এখন সামান্য চা খেয়ে আর কি উপকার পাব?" উত্তর শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন, "দেখ দেখি, ওরা কত কষ্ট করে প্রভুর সেবা করে! ওদের খুব কল্যাণ হবে।"

* * *

লাটু মহারাজের ঘটনাবহুল জীবনের অধিকাংশ গূঢ় রহস্যপূর্ণ ও অপূর্ব। তন্মধ্যে কয়েকটি কথা মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীমার প্রতি লাটু মহারাজের ফল্গুধারার মত নিরবচ্ছিন্ন গভীর প্রেমপ্রবাহ অনেকেই অবগত নহেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস কালে শ্রীশ্রীমায়ের কাজকর্মে সাহায্য করিয়া মাতৃভক্তির নিদর্শন দেখাইলেও শেষজীবনে বলরাম মন্দিরে ও কাশীধামে অবস্থানকালে মায়ের বিশেষ খবর নিতেন না বলিয়া অনেকেই শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার অন্তঃসলিলা ভক্তির কথা অনুভব করিতে পারিতেন না। কোন ভক্ত এবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার মা চিন্ময়ী; আমি সদাসর্বদা তাঁর দর্শন পাই। মা কৃপা করে অহরহঃ আমায় সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিচ্ছেন। আমাকে আর তাঁর স্থূল শরীর দেখতে হয় না।"

শ্রীশ্রীমাকেও কোন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লাটু মহারাজ আপনাকে দেখতে আসেন না কেন? আপনি বাগবাজারে, আর তিনি রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম মন্দিরে। এত নিকটে রয়েছেন অথচ দেখতে আসেন না কেন?"

ইহা শুনিয়া মা ঈষৎ হাসিয়াছিলেন মাত্র। মা যে জগজ্জননী! তিনি সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারেন। লাটু মহারাজের সহিত তাঁহার নিত্য দর্শন হইত চিন্ময়ীরূপে—ইহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে। সাধন-ভজন দ্বারা মন সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা করিতে সক্ষম হইলে এ সব বোঝা যায়।

লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমার প্রতি একটু অবহেলা বা কর্তব্য-হীনতা দেখিতে পারিতেন না। একবার জনৈক ভদ্রলোকের স্ত্রী কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমে দুর্গাপূজা করেন। সেবার তিনি শ্রীশ্রীমাকে রীতিমত আমন্ত্রণ করেন নাই বা পূজার বিষয়ে তাঁহার অনুমতি নেন নাই। শ্রীশ্রীমাকে বাদ দিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে (ব্রহ্মানন্দ) কাশীধামে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মহারাজকে লইয়া কাশীধামে দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ করিবেন এইরূপই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। দৈবক্রমে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাশীধামে মহারাজের আগমন সম্ভব হইল না। পূজা অতীত হইয়া যাইবার কিছুদিন পর মহিলাটি একদিন খোকা মহারাজকে লইয়া লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ তাঁহাদের আসিবার পূর্ব হইতেই সমস্ত শরীর বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া শুইয়া রহিলেন। দুই তিন ঘণ্টা তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া লাটু মহারাজের কোন সাড়া না পাইয়া চলিয়া গেলেন। মহিলাটি মাতৃহীন পূজার

আয়োজন করায় লাটু মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না। পরে বলিয়াছিলেন, "মার অনুমতি না নিয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন! একি অসম্ভব ব্যাপার। যাঁর পূজা তাঁকেই বাদ! কি মূর্খতা! ...র বুঝি খুব পয়সা হয়েছে! টাকা দিয়ে বুঝি গুরু কিনতে চায়! কই গুরুকে আনতে পারলে? টাকা দিয়ে কখনও গুরু কেনা চলে না।"

ইংরাজী ১৯১২ সাল। তখন শ্রীশ্রীমা কাশীধামে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। লাটু মহারাজ ও আমরা কয়েকজন একত্রে সেদিন বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে হঠাৎ লাটু মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "সাক্ষাৎ মা যে আছেন রে! চল্ তাঁকে আগে দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাসময়ে আমরা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীমার দর্শন পাইলাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত দেহ দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবাবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তিনি যে শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন সে বিষয়ে আমাদের আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "তুমি

কাশীতে কিছুদিন থাক, তুমি থাক।" তারপর তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমার নিকট প্রসাদ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়াছিলাম।

* * *

লাটু মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মেয়ে, জগৎ দিলে খেয়ে।" এই কথাতে অনেক বিশেষতঃ অনেক স্ত্রীলোক মনে করিতে পারেন যে তিনি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাহা নহে। কেননা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "এক এক মেয়ে ঘরে আসে, আর ঘর ধনধান্যে ভর্তি হয়ে যায়, আর এক একজন ঘরে এলে ঘর ভেঙ্গে যায়। কি জানিস—বিদ্যা অবিদ্যা স্ত্রী আছে।" তাই 'মেয়ে' কথাটি তিনি অবিদ্যা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, বিদ্যাশক্তির অবমাননা তিনি কখনও করেন নাই। তিনি ভক্তিমতী স্ত্রী-লোকদের সেবা লইতেন, কিন্তু কাহাকেও প্রায়ই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না।

লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকদের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। স্ত্রীভক্ত দেখিলেই তিনি বলিতেন, "তোমরা সীতা, সাবিত্রী, গার্গীকে আদর্শ কর। মাকে আদর্শ কর। মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। দেখছ না মাকে জানবার জন্য আমি কত তপস্যা করছি। মা কি আমার সোজা জিনিস! তোমরা মাকে আদর্শ কর। তাহলে

তোমাদের কল্যাণ হবে।…তোমরা ভগবৎজ্ঞানে স্বামীর সেবা কর। 'পতি পরম গুরু' অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং একথা মনে রেখ। কেবল স্বামীর সেবার দ্বারাও ঈশ্বরলাভ হয় যদি ঠিক মত করতে পার।" তিনি অবাধে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আদৌ পছন্দ করিতেন না। সাধনপথে সকলকে আত্মস্থ থাকিতে নির্দেশ করিতেন। স্ত্রীলোকদিগকেও তিনি পুরুষদের সাথে মেলামেশা করিতে নিষেধ করিতেন। তাহাদিগকে বলিতেন, কাশীতে বেশী ঘোরাঘুরি করো না।

* * *

লাটু মহারাজ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, যাহাকে আশ্রয় দিতেন কোন অন্যায় কাজ করিলেও তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেন না। জনৈক ব্রহ্মচারী অদ্বৈত আশ্রমে ছিল, কোন কারণে মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তখন শীতকাল। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে লাটু মহারাজের শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আশ্রিতকে আশ্রয় দাও, অভয় দাও।" একবার বিমল নামে জনৈক ভক্ত আট বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা যায়। লাটু মহারাজকে সে বলিত, "আপনি তো সাক্ষাৎ মহাবীর।" শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি মাথায় রাখিয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল। ছেলেটির ঠাকুরমা শোকে বিহ্বলা হইয়া প্রাণের জ্বালায় কাশীধামে চলিয়া আসেন এবং লাটু মহারাজের নিকট

অনেক কান্নাকাটি করিয়া শান্তি প্রার্থনা করেন। লাটু মহারাজ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বিমল চলে গিয়েছে, তোমার কি দুঃখ হয়েছে ? তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ আমার হয়েছে। যাও, গঙ্গায় স্নান করে এস।" তাঁহার আদেশানুযায়ী ভদ্রমহিলা গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর এক অভূতপূর্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে শান্তির বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। এমনভাবে লাটু মহারাজ তাঁহার জীবন ভরিয়া কত যে শোকার্ত ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে আশ্রয় দিয়া অজ্ঞাতে শান্তিদান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রিত হইলে তিনি সর্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। আর আমাদের বলিতেন, "আশ্রিতকে আশ্রয় দাও, অভয় দাও।"

* * *

স্বর্গীয় গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রায়ই গিরিশবাবুর খবর লইবার জন্য সাধু ও ভক্তদের পাঠাইতেন। গিরিশবাবুও লাটু মহারাজের বলরাম মন্দিরে অবস্থান কালে প্রায়ই সেখানে আসিতেন এবং তাঁহার খোঁজ খবর লইতেন।

একবার কাশীধাম হইতে কলিকাতা যাইবার কথা হইলে

লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ও পাড়ায় লোকই নাই ; কার কাছে যাব।" এখানে লোক বলিতে তিনি গিরিশবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। তবে গিরিশবাবুর সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ওকে বুঝতে তোরা পারবিনে। গোলমেলে জীবন। তোরা স্বামীজীকে আদর্শ কর।" গিরিশবাবুও লাটু মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন, "ওরকম বেদাগ সাধু আর দেখিনি, ওঁর হাওয়ায় তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে।"

* * *

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর প্রতি লাটু মহারাজের একনিষ্ঠ ভক্তি মহাবীরের মত ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সীতাহরণ হয়েছিল বলে আমি আর দক্ষিণতীর্থে গেলাম না।" তাঁহার এই অপূর্ব ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়!

* * *

অন্য সম্প্রদায়ের মঠে যাতায়াত সম্বন্ধে তিনি খুব সাবধানে চলিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন "একটা ভাবই ভাল করে বুঝতে পারছ না ত দশটা ভাব বুঝবে কি করে? ঠাকুরের যে অপূর্ব ভাব ভালবাসা তাই ভাল করে বুঝতে পারলে এজন্মেই উদ্ধার হয়ে যাবে।"

লাটু মহারাজ সর্বসময় উপদেশ দিতেন : "পবিত্র হও, তবে তো তাঁকে বুঝতে পারবে।"

* * *

কাশীতে আমার পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার বাবু, তাঁর স্ত্রী, জামাই সহ আসিয়াছিলেন। তিনি লাটু মহারাজের আদেশ মত সাধু সেবা করিয়েছিলেন। সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম হইতে অন্যান্য কয়েক জন সাধুও আসিয়াছিলেন। সাধুদের আহারান্তে বিকালে মহারাজ সামান্য মাত্র খাইয়াছিলেন। ইহাতে ইঞ্জিনীয়ার বাবুর স্ত্রী খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ আজ আপনার কিছুই খাওয়া হল না।" তাঁর কষ্ট দেখে মহারাজ বলিলেন, "কাল তুমি আমাকে লুচি খাইও।" পরের দিন মহারাজ খুব তৃপ্তির সহিত সেবা করিলেন। আমাকে ইঞ্জিনীয়ার বাবুর স্ত্রী সম্বন্ধে বলিলেন "খুব ভক্তিমতী, লক্ষ্মী, ওর জন্যই ইঞ্জিনীয়ার বাবুর এত উন্নতি"। স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি আমায় মাসে মাসে কিছু সাহায্য করো"। কয়েক মাস সাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীরও মহারাজের উপর অগাধ ভক্তি বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ তিনি মারা যাওয়াতে মহারাজ খুব দুঃখিত হইলেন।

পুঁটিয়ার রাণীর জামাই শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যাল তাঁহার বড় ছেলের বিবাহে বিভূতিবাবুকে দেশে যাইবার জন্য মহারাজের নিকট অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। সে সময় মহারাজের শরীর ভাল ছিল না এবং মতও ছিল না। তবে বিশ্বেশ্বরবাবু আসায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিলেন। মহারাজ সেবককে বলিলেন, বিভূতিবাবুকে অন্নকূটের প্রসাদ দিতে। তাহাতে বিভূতিবাবু বলিলেন, আমার নিকট

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আছে। বিভূতিবাবু জগন্নাথের প্রসাদ ছাড়া অন্য প্রসাদ নিতেন না। মহারাজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বিভূতিবাবুর প্রসাদে গোঁড়ামি ছিল। মহারাজ তেজের সহিত বলিলেন, "প্রসাদে দ্বিধা করতে দেব না, বিভূতিবাবু।" বিভূতিবাবু ফিরে এসে শুনলেন মহারাজ দেহ রেখেছেন। ইহাতে তিনি মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

জনৈক ভক্ত কলিকাতা হইতে মহারাজের শ্রীচরণে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হঠাৎ মহারাজ আমাকে বলিলেন যে মুখুয্যে মহাশয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য রেখো। একথা তাঁর শ্রীমুখ হইতে কোন দিন শুনি নাই। পরে সুবিধা মত মুখুয্যে মহাশয়কে বলিলাম যে মহারাজের একথা বলার অর্থ কি ? তাহাতে তিনি বলিলেন, "মহারাজ আমার বাড়ীতে কোন কোন দিন দুপুরে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আমি কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষা দিইনি। বরং টিটকারী দিয়েছি, কারণ তিনি সাধু হয়েও জামা জুতো ব্যবহার করেন। এখন বুঝতে পাচ্ছি তিনি সেই শ্রদ্ধাহীন ভিক্ষা দেওয়া স্মরণ করে এই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, আমার কত সেবা যত্ন কচ্ছেন। আমার মনে এখন দুঃখ হচ্ছে যে আমি কি অন্যায় করেছি, সেজন্য অনুতাপ হচ্ছে। আর কৃতজ্ঞতা যে কত মহৎ গুণ তা শিখছি।"

আজ কাল যা দিন পড়েছে—যাকে উপকার করেছে তার

পরিবর্তে তার অনিষ্ট করে, সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন "সে যে আমার নিন্দা করে, আমি ত তার কোন উপকার করিনি।" যিনি উপকৃত হন তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন—তবে আজ কাল এটা বিরল।

জনৈক ভক্তকে মহারাজ বলিয়াছিলেন, তোমার ভাইরা তিলভাণ্ডেশ্বরের ভোগ বন্ধ করে দিবে, কিন্তু তুমি বন্ধ করো না। কাশীতে তিলভাণ্ডেশ্বরের ভোগ দেওয়া বহু ভাগ্যে হয়। তিলভাণ্ডেশ্বর অনাদি লিঙ্গ, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। ওখানকার সাধুদের আমার খুব ভাল লাগে। মাধুকরী করে খায় ও বাবার সেবা করে। ভক্তটি এখনও তাঁহার হুকুম প্রতিপালন করিতেছে।

সন্ন্যাসীদের প্রতি জনৈক ভক্তের একটি আত্মীয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। উক্ত ভক্তটি উহা লাটু মহারাজকে বলিলে তিনি এইরূপ উত্তর দেন।

"তোমার আত্মীয় আমাদের কিংবা আমাদের ঠাকুরকে নাই বা মানলেন? তাতে আর কি এসে যায়? তিনি যখন সেই মূল ভগবানকে ধরে আছেন, তখন তাঁর কল্যাণ হবেই। যদি ভগবানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি আন্তরিক হয়, তাহলে তাঁর ভ্রম ভগবানই দূর করে দিবেন। তাঁর কৃপায় তিনি বুঝতে পারবেন যে আমরাও তাঁরই (ভগবানের) কাজ করছি।"

* * *

লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করেন। ভক্তটি তদুত্তরে বলেন যে, তিনি ভর্ৎসনা করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অন্তরে যে বিন্দুমাত্র ক্রোধও নাই, তাহা তাহার জানা আছে। উহা শ্রবণ করিয়া পূজনীয় লাটু মহারাজ বলেন—

"সাধুকে দিক্ (বিরক্ত) করলে মাঝে মাঝে বকতে হয় বই কি। তবে কি জান, আমি প্রত্যক্ষ দেখছি, তিনিই সব সেজেছেন—সাধু, চোর, মাতাল, লম্পট, বেশ্যা সব।

"যে এমন দেখে—সে কি কারুর উপর রাগ করতে পারে? না হিংসাদ্বেষ করতে পারে? যেমন থিয়েটারে একজন মেয়েমানুষ সতী সেজেছে, আর, একজন পুরুষ মানুষ মাতাল সেজে তার উপর জুলুম গালি করলে—তারপর প্লে (play) যখন খতম হল, দুজনে সাজঘরে গিয়ে খুব হাসি-খুশি আনন্দ করতে লাগল, তেমনি আর কি!"

এ জগতে যত স্ত্রী পুরুষ রূপ ধরে তিনি নানাভাবে প্লে করছেন। একটু অহং রেখে দিয়েছেন বলে সব ভেদবুদ্ধি রয়েছে—কেউ কারুর অনিষ্ট করছে, আবার কেউ উপকার করছে, কেউ ধর্ম উপদেশ দিচ্ছে—সৎপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ অসৎ পথে টেনে নিচ্ছে। এই হল দুনিয়ার ব্যাপার। কিন্তু যে সবার ভিতর তাঁকে দেখে সে কিছুতেই চঞ্চল হয় না জানবে।

এক সময় তিনি জনৈক ভক্তকে ভর্ৎসনা করিবার পরে

যখন আপনা আপনি ঐরূপ বিড়বিড় করিয়া নিজের মনকে ধমকাইতেছেন,—ঐ ভক্তটি বুঝিতে পারিলে—তখন হাসিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন—"আমি সাধু হয়েছি, এখনি আমাকে কেউ একটা ছোট বড় কথা বললে আমি হয়তো রাগ সামলাতে পারব না, নিজের অভিমান যখন গেল না, আবার অপরকে উপদেশ দিতে চায়, এমনি মনের সংস্কার। লাল কাপড় গৈরিক বসন পরলেই বুঝি কাম, ক্রোধ, লোভ সমস্ত দমন হয়ে একেবারে মহাসাধু হয়ে যায়। যখন গেরুয়া দেয়—তখন কয়টা প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, আজ হতে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গেরুয়া পরবার পর দিনেই ঐ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায় কি? সেই উচ্চ অবস্থা লাভ করতে হলে নির্জনে অনেক কঠোর তপস্যা করতে হয়, তবে ভগবানের দয়া হলে, সব থেকেও কিছু থাকবে না, অর্থাৎ তাতে জীবের বা নিজের কোন অনিষ্ট হবে না। সাধু সব ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তার অভিমান সহজে যেতে চায় না। সাধারণ জীবের ত কথাই নেই, তারা সাধন ভজনের ধারেও যেতে চায় না। কিন্তু যাঁরা খুব সাধন করেছেন, এমন সাধু লোককেও অভিমানে আত্মহারা হতে দেখা যায়, সাপের লেজে একটু পা দিলেই যেমন ফণা তুলে ফোঁস করে উঠে, তেমনি কেউ যদি একটু কম সম্মান করলে বা ছোটবড় কথা শুনিয়ে দিলে তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়,

অভিমানে ভিতরে ভিতরে ফুলতে থাকেন। তার মানে আর কিছু নয়, তাঁর তখন আসল বস্তু লাভ হয়নি। সেই পরমানন্দের কিঞ্চিৎ কণা লাভ হলে তার কি আর কারুর উপর ক্রোধ অভিমান এইসব হয়? কাকে সে ক্রোধে শাপ গাল দেবে, সে যে তখন তাঁর কৃপায় দেখতে পায় যে সবই তিনি সেজে রয়েছেন। চোরই বল, সাধুই বল, অসাধুই বল, ধনীই বল, দরিদ্রই বল—এই সব ভিন্ন ভিন্ন বেশে তিনিই বিচরণ করছেন। ভগবৎ কৃপায় এইরূপ চোখ যার খুলে গেছে, সেরূপ সাধু-মহাত্মা বিরল। নইলে লাল কাপড় তো সবাই পরছে, কিন্তু সেই কাপড়ের মর্যাদা রক্ষা করে কয়জন? তাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত এই পবিত্র বসন শুক, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনাতন প্রভৃতি প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ এবং বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পরেছিলেন, আমিও যেন তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধন্য হয়ে যাই; তবেই সেই সাধু বেঁচে যাবে। জীবনের মধ্যে কত বড় বড় তুফান কাটিয়ে শেষে তাঁর চরণে পৌঁছিবে।

*   *   *

লাটু মহারাজ একাদশীতে কখনও অন্ন আহার করিতেন না। একবার একাদশীর আগের দিন পেটের অসুখ হওয়ায় ডাক্তার চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতে বলেন। তিনি রাজী হন নাই। বলিতেন, একাদশীতে অন্ন একেবারে নিষিদ্ধ।

৺শিবরাত্রিতে লাটু মহারাজ উপবাস করিতেন। এই দিন তিনি ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, মহাবীর প্রভৃতিকে মালপো লুচি, মিষ্টি ইত্যাদি ভোগ দিতেন। একবার ভিড়ে হঠাৎ ঢুণ্ডিরাজের সম্মুখে কিছু পূজার দ্রব্য পড়িয়া যায়। তাই খুব নির্জন বলিয়া ৺তিলভাণ্ডেশ্বরকে খুব পছন্দ করিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, কোথায় ঘোরাঘুরি করবি? এই ত সাক্ষাৎ ৺বিশ্বনাথ। শরীর ত্যাগের পূর্ববৎসর ৺শিবরাত্রির দিনে জনৈক ভক্তের পুত্র বিমলের সহিত ৺তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করেন। পূজান্তে সামান্য জল খাইয়াছিলেন। এইবার ব্যতিক্রম দেখা গেল। অবশ্য শরীর খুবই খারাপ ছিল। তিনি সেবাশ্রমের অন্ন সুস্থ শরীরে সাধুদের খাইতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন উহা রোগীদের জন্য, সাধুদের গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বামীজী বলিতেন যে ফণ্ডের যাহা তাহা উহাতেই খরচ করা উচিত। অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খুব জোরের সহিত লইতে বলিতেন। তিনি ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজকে বলিয়া দিতেন, সাধুদিগকে সেবাশ্রমে পাঠিয়ো না। অন্ততঃ ৩ দিন অন্ন দিও। তারপর খুব কাতরভাবে বলবে যে আর বেশি দিতে পারলাম না।

৺কাশীধাম ছাড়িয়া কাহারও যাওয়ার কথায় লাটু মহারাজ খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কোন ভক্ত বলিলেন, আবার শীঘ্র ফিরব। তাহাতে মহারাজ বলিলেন

আবার আসা হবে কিনা সন্দেহ। তিনি বেশী ঘোরাঘুরি আদৌ পছন্দ করিতেন না। একস্থানে বসিয়া ডাকাই ভালবাসিতেন। ৺কাশী বাসের উপর খুব জোর দিতেন। বলিতেন যদিও সেই নির্জন কাশী এখন নাই, তাহা হইলেও ৺কাশীর মাহাত্ম্য যাইবে কোথায় ?

অদ্বৈতাশ্রম হইতে চন্দ্র মহারাজ ৺বিজয়ার দিন লাটু মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলেন। আনন্দিত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, তোমার এই খোঁড়া পঙ্গু শরীর, আসার কি দরকার ছিল ? এত কষ্ট করে আসা এতে আমাকে দুঃখ দেওয়া হয়।

এত সিঁড়ি ভেঙ্গে কত কষ্টে উঠা। প্রাণে কাহারও কষ্ট দিতেন না। বলিতেন, রুষ্ট কথা বললে সে কিছু মনে করতে না পারে ; তবে ভিতরে যিনি আছেন, তিনি যদি রুষ্ট হন তবে প্রতিফল পেতে হবে। অবিবাহিত যুবককে খুব পবিত্র-ভাবে জীবন যাপন করিতে বলিতেন। গুরুভক্তির উপর খুব জোর দিতেন। গুরুর দরুণ যে কোন কাজকে পরম উপাদেয় সেবার কার্য মনে করিতেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের স্বামী যোগবিনোদ সম্বন্ধে বলিতেন, ও কি গুরু-সেবাটাই করেছে। গুরুর জন্য আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে, ৺রামবাবুর বিধবা মেয়েদের জন্য। এ জন্য অনেকে না বুঝে তাঁকে দোষ দিত। এটা ঠিক নয়। আমি একবার রাম দত্তের অসুখের খবর পেয়ে কাঁকুড়গাছিতে তাঁর সেবাতে

গেলাম। গুরু-সেবা কি কম ভাগ্যের কথা। গুরু-সেবায় অসম্ভব সম্ভব হয়। পরচর্চা সম্বন্ধে খুব কড়া ছিলেন। বলিতেন, ঐ করতে করতে ঐ দোষ নিজ চিত্ত গ্রাস করে। স্বামী বিরজানন্দজী একবার মায়াবতী হইতে আসিলে লাটু মহারাজ তাঁহাকে খুব যত্নপূর্বক খাওয়ালেন। বলিলেন, ও স্বামীজীর যে সেবাটা করেছে, বলতে নেই ওর ঠিক ঠিক গুরুভক্তি। এই কথা বলিয়া অনেকের কাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিরজানন্দজীরও লাটু মহারাজের উপর খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।

* * *

কাশী হইতে জনৈক ভক্ত কলিকাতা আসিলে পূজনীয় লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কাশীর বেগুন ও পেয়ারা দিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন, "আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।" মা একটু মুচকি হাসিয়াছিলেন। মা একবার নিজমুখে বলিয়াছিলেন, একমাত্র লাটু ছাড়া আমার কাছে আসবার আর কারও আদেশ ছিল না। লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা কর। তার কাছে তুমি থাক, তোমার কল্যাণ হবে।

* * *

ভগিনী নিবেদিতার গুরুভক্তির কথা খুব বলিতেন। কাশ্মীর যাওয়াকালীন স্বামীজী ঘোড়া থেকে নাবছেন আর নিবেদিতা জুতার ফিতা খুলে দিচ্ছেন। লাটু মহারাজ

প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।" বলিতেন,—গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, গুরুর সঙ্গ না করলে গুরুর মহিমা বুঝা যায় না। তবে ইহাও বলিতেন যে, সব সময়ে গুরু-শিষ্যে এক-সঙ্গে থাকা ঠিক নয়, কারণ, গুরু রাগ করিতেছেন, সাধারণ লোকের ন্যায় দেহযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এই সব দেখিয়া সংশয় আসিতে পারে। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিতে নাই। ভগবান মনে করিতে হইবে।

* * *

কাশীতে রোজ শিবদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে বলিতেন। বলিতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় রোজ দর্শন করি, কিন্তু শরীরের জন্য পারি না। তোমরা আমার নকল করো না। বৈশাখ মাসে মহারাজ রোজ গঙ্গাস্নান, বেলপাতায় রামনাম লিখিয়া ফল মিষ্টি লইয়া বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেন। অন্নপূর্ণা বাড়ীতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ জপ করিতেন।

গয়ায় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কথায় খুব জোর দিতেন। স্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী গয়ায় পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। তাঁকে চিঠি লিখিয়া ভক্তদের শ্রাদ্ধাদি করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন। ইহাও লিখিতেন,—ভক্তটিকে যত্ন করিবে, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।

* * *

সাধুদের নির্ভরতা সম্বন্ধে খুব জোর দিতেন। বলিতেন,

—নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব না হলে তাঁহার উপর নির্ভর করা যায় না। তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনি সব সুবিধা করে দেন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। সাধুরা ভাবে, কোথায় থাকব, কোথায় খাব। এই সব দুর্বলতা। সাধুদের নির্জন স্থান দেখে তপস্যায় লাগা উচিত, বলিতেন।

যে কোন সম্প্রদায়ের সাধু লাটু মহারাজের নিকট মাঝে মাঝে ভিক্ষার জন্য আসিত, তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। জনৈক দণ্ডী সন্ন্যাসী (স্বামী মাধবানন্দ) লাটু মহারাজের কাছে আসিতেন ও ভিক্ষা করিতেন। হঠাৎ একদিন সাধুটি ভিক্ষার জন্য দেরিতে আসায় লাটু মহারাজের সেবক তাঁহাকে বলিল যে, রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন আর ভিক্ষা হইবে না। লাটু মহারাজ শুনিয়া তখনই বলিলেন,—সে কি! আবার ভাত রান্না কর। সাধুজীকে বলিয়া দিলেন, যে দিন ভিক্ষা করিবে সে দিন সকালে আসিয়া বলিয়া যাইবে তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না। মহারাজ উভয়কেই সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন যাহাতে কাহারই কোন অসুবিধা না হয়। ঐ দণ্ডী সাধুটির লাটু মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ছিল।

*　　　*　　　*

জনৈক ভক্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন, শুধু গঙ্গাস্নান করে কি হবে, ভিখারীকে কিছু দিতে হয়। রোজ পয়সা না দিতে পার, এক মুঠো করে চাল দিও। ভক্ত মহিলাটি

মহারাজের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজ বলিতেন, সাধুর সাধুবৃত্তি না থাকলে সবই বৃথা। গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আধ পয়সার গেরুয়া মাটি কিনে ছাপালেই কি সাধু হওয়া যায়? সাধু হবে মিষ্টভাষী, সৎ, শান্ত। কেহ আর কিছু না পারলেও দুটো মিষ্ট কথা বলে তাদের আপ্যায়িত করবে।

*   *   *

বহু ভাগ্যে কাশী বাস, কাশীপ্রাপ্তি, একথা লাটু মহারাজ খুবই বলিতেন। হঠাৎ কাহারও কাশী আসিবার কিছু পরেই কাশীপ্রাপ্তি হইলে, ইহা খুব ভাগ্যের কথা বলিতেন। এইভাবে কাশীতে হঠাৎ শরীর যাইলে, তিনি তাঁহাদের শরীর যাইবার সময় আহ্নিক লক্ষণাদির বিশদ বিবরণ লইতেন।

বৃহস্পতিবারের বারবেলা তিনি খুবই মানিতেন। এমনকি জনৈক ভক্ত ছুটিতে আসিয়াছেন, তাঁহার আফিস শুক্রবার খুলিবে, এমত অবস্থায় বৃহস্পতিবার যাইতে হইবে মহারাজকে বলায়, মহারাজ বলিলেন "আমি ওসব জানি না।" ভাই ভূপতি মহারাজের নিকট কিছুদিন ছিলেন। তিনি প্রত্যহই সকালে বিকালে বেড়াইতেন। 'ভূপতি ভাই' বাহিরে যাইলে হাত জোড় করিয়া মহারাজের অনুমতি লইতেন। বৃহস্পতিবারে বাহির হইলে বলিতেন, "ভূপতি, আজ বৃহস্পতিবার, কোথা যাবি?" ভূপতি ভাই খুব

বিনয়ের সহিত মহারাজের অনুমতি লইয়া বাহির হইতেন। গুরুভাই গুরুভাই-এর প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তি সত্যই দুর্লভ।

সংসারে থাকিতে গেলে পরস্পর পরস্পরে প্রতি সাহায্যের কথা মহারাজ খুবই বলিতেন। বলিতেন, "এটা মানুষের ধর্ম, যে না করে সে পশু।"

সাধু ব্রহ্মচারীদের গুরুজনের আদেশ প্রতিপালনের প্রতি খুবই জোর দিতেন। বলিতেন "আমরা তো কালী-বাড়ীর প্রসাদ পেতুম; ঠাকুরের খেতুমও না পরতুমও না। কিন্তু একবারও মনে হত না যে এঁর হুকুম কেন মানি!"

* * *

১৯১৫ সালে বৈশাখ মাসে স্বামী শান্তানন্দ জনৈক ভক্তকে মহারাজের শ্রীচরণে লইয়া যান। মহারাজকে প্রণাম করা মাত্রেই বলিলেন, ওকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও, তা না হলে ওর ছোট ভাই পাগল হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ঐ ভক্তের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। ভক্তটি বাড়া যাইয়া দেখিল, তাহার ভাই সত্যই পাগলের মত রাস্তায় ঘোরাঘুরি করিতেছে।

ভক্তটিকে দেখিয়া সে আবার অতি সহজে স্থির হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার অনেক-দিন পর ভক্তটি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া সঙ্ঘে যোগদান করে। স্বল্পকাল মঠে অবস্থানের পর, কোন কারণে ৺কাশী-ধামে যায় এবং অশেষ সৌভাগ্য বলে লাটু মহারাজের

অহৈতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু খুব কঠোরতার অভ্যাস না থাকায়—দিবাভাগে তিনটা সাড়ে তিনটায় এবং রাত্রেও ঐরূপ ১২টা ১টায় ছত্রের শুকনা ভাত ডাল রুটি খাইতে খাইতে ক্রমে ক্রমে অরুচি ধরায় সে কয়েক মাস পরেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তা ছাড়া অমন নির্জনতাও ভাল লাগিতেছিল না—যদিও লাটু মহারাজের উপর তাহার অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ছিল। ক্রমে এমন হইল যে, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিতে কৃতসংকল্প হইয়া পাথেয় বাবদ কয়েকটা টাকা সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র অতি গোপনে রাখিল। যাত্রার দিন স্থির করিয়া মহারাজজীর অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল···। সেই দিন তিনি দিনের আহারান্তে মুখ ধুইবার সময়ে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া যেন কাহার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলাপ করিতেছিলেন "আমাকে অবিশ্বাস, পাছে আমি ওর সামান্য ঐ টাকা আর না দেই তাই ওখানে ঐরূপভাবে রেখেছে ··।" ভক্তটি সবই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল বটে, কিন্তু সে মঙ্গলঘট উল্টাইয়া দিয়া আপন মঙ্গল না চাহিয়াই রওনা হইয়া গেল। যাইবার পূর্বে ভাবে তাঁহার শ্রীমুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহাই প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

* * *

এক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, মহারাজ, স্বয়ং ব্যাসদেবেরই

যখন স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল, তখন আমাদের মত অজ্ঞান ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবের উপায় কি হবে? এই সব কুসংস্কার কি করে দূর হবে?

মহারাজ: "যে সাধুর ভগবান দর্শন হয়েছে এমন সাধুর সঙ্গ অনেক কাল ধরে করতে করতে মনে সৎসংস্কার প্রবল হয়ে উঠবে তখন অসৎ সংস্কার সব নাশ হয়ে যাবে। অসৎটা চলে গেলেই জ্ঞানের উদয় হবে, আনন্দ লাভ হবে।"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "যার টাকার জোর আছে আর গায়ের জোর আছে তার কাছে ভগবান-টগবান নেই (অর্থাৎ সে মানে না) সে 'ডোণ্ট কেয়ার' (গ্রাহ্য করে না)। গৃহস্থই বল আর সন্ন্যাসীই বল অভিমান না টুটলে কেউ ভগবানের পথে এগুতে পারবে না। ধন, জন, বিদ্যা, মান, যশ এই সব অভিমানের গাঁট গৃহস্থকে পেরুতে হবে। আর সন্ন্যাসী মা বাপ আত্মীয় বন্ধু সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেও আটকে যায়; নিজে মস্ত বড় সাধু মহাপুরুষ এই আত্ম-অভিমানে। সে ভগবানের কাঙ্গাল না হয়ে লাল কাপড়ের দোহাই দিয়ে লোকের কাছে খাতির চায়; আর তা না পেলে অভিমানে ফুলতে থাকে। যে জানে সে সন্ন্যাসী হয়ে কারো মাথা কিনে নাই, সে একটু অভিমান মনে উঠলেই তাকে চাবুক মেরে মেরে দুরস্ত করতে থাকে। এমনি করে ভগবানের দয়ায় তার অভিমান টুটে যায়।"

জনৈক সাধু লাটু মহারাজকে বলিলেন অমুক আপনাকে

ভালবাসা জানিয়েছে। তিনি তখন একমনে গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন। কতকটা অন্তর্মুখ ভাব। উদাসীন দৃষ্টিতে সাধুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "কি বললে, ভালবাসা? ভালবাসা! ভালবাসা! ভালবাসা কথাটা বলা খুব সোজা, কিন্তু ভালবাসতে জানা বড় কঠিন। ভালবাসতে আর কাউকে দেখি না। তিনিই (ঠাকুর) একমাত্র স্বার্থহীন ভালবাসা দিতে জানতেন। তাঁকে পিতা বলে জানি।" পিতা কথাটি দীর্ঘভাবে টানিয়া উচ্চারণ করিলেন। এখনও উহা কানে বাজিতেছে।

অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, ওরে সাধারণ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ত ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ।

* * *

ভগবান সম্বন্ধে তর্ক বিচার দ্বারা কেহ কখনো ঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারেন নাই, পারবেন না এবং পারা উচিতও নয়। ভগবান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে ভগবদ্‌ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যাঁরা যথার্থ তত্ত্ব বুঝে সাধন করেন, তাঁরা চুপ করে হাসেন, তর্ক করেন না, তিনি অচিন্ত্য অসীম অনন্ত আছেন, থাকুন। যে জিনিসকে ভাবতে পারলি, সেটা আর অনন্ত রইল না, সান্ত হয়ে গেল। ভূমা ভাবতে গেলে মাথা ফেটে যাবে। অসীমের যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ পেলেই যখন আমাদের কাজ হয়ে যায়, তখন অচিন্ত্য বিষয় নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া কেন? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের

খবরে দরকার কি? প্রকৃতির মায়াকাচের পারে যে বস্তু তার নাম অচিন্ত্য, মানুষের চিন্তার দৌড় সেখানে পৌছাতে পারে কি? তা যদি হয় তা হলে আমাদের প্রকৃতিতে ডুব দিয়ে থেকে সেই প্রকৃতির পারে যিনি, তাঁর বিষয় নিয়ে বৃথা তর্ক করা পাগলামি বই ত নয়। মায়া থেকে মাথা তুলতে পারলে তবে মায়াতীত যিনি তাঁকে দেখতে পাবে।

তা ভিন্ন সদ্‌গুরুর উপদেশ মত একনিষ্ঠ হয়ে সাধনপথে এগিয়ে যাও, তখন তাঁর কত আশ্চর্য ভাব দেখে অবাক হয়ে যাবে, শান্তি পাবে। নিজের নিষ্ঠাতে অটল থেকে সকল মতের আদর করতে হবে, কোন মতকে ঘৃণা করলে চলবে না। সেই এক সচ্চিদানন্দই বস্তু। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি তাঁর কত নাম আছে। যখন তিনি পরিচালকরূপে জগৎকে চালাচ্ছেন, তখন তিনি ঈশ্বর। যিনি মায়াকেও তাঁর নিয়মের বাধ্য করে রেখেছেন, তিনিই ঈশ্বর। কোন রকম বিশেষ চিহ্ন দেখে তাকে ধরতে, বুঝতে পারা যায় না। যখন 'সৎপ্রধান', তখন তিনি ব্রহ্ম। যখন 'চিৎপ্রধান', তখন তিনি পরমাত্মস্বরূপ। যখন তিনি 'আনন্দপ্রধান', তখন তিনি ভগবান। অদ্বয়জ্ঞানই পরম তত্ত্ব, পরম কারণ। সেই অদ্বয়জ্ঞান সাধকের হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে—"যেমন ঝাড়ের কলমকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে কতরকম রং দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি সকলের হৃদয়ের ভাব তো একরকম নয়"।

ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুসারে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, কিন্তু তিনি একই আছেন।

* * *

ভক্ত হরমোহন মিত্রের বাসাতে দড়ির খাটিয়ায় লাটু মহারাজ পড়িয়া থাকিতেন, আর বলিতেন—হামকো দো পয়সা কা চানা ভাজামে হো যাহাহৈ, (ওর) ক্যা পরোয়া।

বলরাম মন্দিরে আছেন। জনৈক ভক্তকে বলেন "তোমার বাবা আছেন, মা আছেন, স্ত্রীপুত্র আছে, আমার কেউ নেই। আমি অনাথ। আমার গুরু বই আর কেউ নেই। তাই গুরুস্থান থেকে পঞ্চকোশীর মধ্যে পড়ে আছি।"

তিনি বলিতেন, "জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রুটি খাওয়া, এ ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই।" আমি খুব বার্ডসাই খেতুম। আমায় বললেন, "এখানে বাহিরের লোক আসে, তাদের সামনে বার্ডসাই খেও না।" আমি বল্লুম—"আমি লুকিয়ে খাব? তা হবে না।"

মা পৃথিবী শরীরটা একদিন টেনে নেবে, বলবে ঢের মজা করেছ, এখন দাও। আমি রাস্তায় চলতে পারি না—পাঁচজনে দিক্ করে।

রাখাল মহারাজ কল্যাণ করছে—ভাল, কল্যাণ হলেই ভাল। আমার যে তাই কর্তে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি বলি আমায় দিক্ করো না।

একজন স্ত্রী ভক্তকে তিনি বলিলেন, "তোমার শ্বশুর বাড়ী থাকা সুবিধে হবে না। বাপের কাছে থাকলে ভাল হয়। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়বে। তা হলেই শান্তি পাবে।"

একদিন লাটু মহারাজ বলেন, "স্বামীজীর সঙ্গ করে কত ভালবাসা পেলাম, আর তোদের সঙ্গ করে দোকানদার পর্যন্ত গালি দিয়ে গেল। একেই বলে কর্মফল। (জনৈক স্ত্রী ভক্তের প্রতি) তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি তা তিনিই জানেন।

"অমৃত জেনেই খাও, আর না জেনেই খাও, অমৃতের গুণ যাবে কোথা?"

"পায়ের ধূলি লওয়াই কি বড়। মনে রাখাই বড়।"

* * *

তিনি কলিকাতার মত শহরেও দরকার পড়িলে রাত্রিতে কোথায়ও যাইতে চাইতেন না। একজন সঙ্গীর দরকার হইত। এ বিষয় কি জানি কিরূপ একটা অব্যক্ত ভয় দেখা যাইত।

* * *

জীবনের শেষ ভাগে কাশীতে স্পষ্টই দেখা যাইত যে, তিনি লোকের ভিতরটা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন। যে কথাটি মনে করিয়া, যে ভাবটি লইয়া কেহ গিয়াছে স্পষ্টই তিনি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ওরে হবে রে, তোর

হবে।” আবার কখনও বলিয়াছেন, “তোমার এখনও অনেক ভোগ আছে।” এই সময় তাঁর শরীর যখন খুব অসুস্থ ছিল তখন একদিন তাঁকে ধরিয়া অন্নপূর্ণার দর্শন করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি দেবীর সমক্ষে অপরের সাহায্যে কোনরূপে উপস্থিত হইয়া ভীড়ের ভিতর করজোড়ে নিস্পন্দ পলকহীন আঁখিতে মায়ের চিন্ময় আবির্ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহার সেই দিব্য আবিষ্ট ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদের জন্ম, প্রাণ, মন, চক্ষু সব সার্থক করিয়াছেন। এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী তখন স্থাণুবৎ দাড়াইয়া আছেন। একেবারে বাহ্যসংজ্ঞাহীন নিস্পন্দ; কিন্তু দুই চক্ষু হইতে দরদর ধারে ধারা পড়িতেছে। সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্প পুলক ও রোমাঞ্চ। অতি কষ্টে মহামায়ীর সেই অন্নকূট মহোৎসবের বৃহৎ জনতার ভিতর হইতে ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার আস্তানায় ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। সেদিন তাঁহাকে কোন কিছু আহার করিতে দেখা গেল না। নিঃশব্দ হইয়া শুইয়া রহিলেন। কিছু খাবেন কি ? প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

* * *

জনৈক ভক্ত, যিনি তাঁহার সেবার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন, একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার সমক্ষে পা নাচাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া তেজের সহিত

তাঁকে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত ভারী বেয়াদব দেখছি, সাধুর সামনে পা নাচানো। ওটা অতি হাবাতে লক্ষণ। খবরদার আর করবে না। পরমহংসদেব মানা করতেন।"

সাধুদের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা দেখিয়াছি। ভক্তদিগকে প্রায়ই সাধুসেবার উপদেশ দিতেন এবং নিজেও যথাসাধ্য সাধুসেবা করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। আমি এক সময়ে তাঁকে নিত্য ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতাম। পাঠ শুনিতে শুনিতে এমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন যে, অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকিতেন। তখন আমি ভাবিতাম, তাঁহাকে পড়িয়া না শুনাইলেই ভাল ছিল।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ কাশীতে অবস্থানকালে শেষের দিকে, অনবরত 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করিতেন। কোন ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণসমীপে আসিয়া প্রণাম করা মাত্র, তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতেন "মায়া, মায়া।" তাঁহার এই ভাব পুরাতন ভক্তেরা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নূতন ভক্ত অবাক হইয়া মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কোন ভক্তের আসার কি উদ্দেশ্য তৎসম্বন্ধে মহারাজ বিড় বিড় করিয়া বলিতেন। ভক্ত চলিয়া গেলে মহারাজ অমনি বলিতেন, "শালা মায়া ফেলে দিয়ে চলে গেল।" কোন দুঃখের খবর শুনাইলে মহারাজ অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত ঐ ভক্তের কথা শুনিতেন, কখনও বা বলিতেন, "মায়া একবার

ফেলে দিলুম আবার তুলে নিলুম, সব সময় কি ঐ ভাবতে হবে ?''

*　　　*　　　*

মহারাজ ভক্তদের বিবাহ না করিয়া পবিত্রভাবে জীবন কাটাইয়া দিতে এবং বাপ মায়ের সেবা করিতে বলিতেন। তিনি সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ যুগে সন্ন্যাস ঠিক ঠিক বজায় রাখা শক্ত, বরং বিবাহ না করিয়া পবিত্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে বলিতেন। পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে বিবাহ করা ভাল মনে করিতেন। বিবাহ করিবে না অথচ অপবিত্র হইবে ইহা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি লৌকিকতা আদৌ পছন্দ করিতেন না। সাধুর পক্ষে লৌকিকতা খুব খারাপ। যাহা সত্য মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিতেন।

*　　　*　　　*

তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমহারাজের কথা বলিতেন। মেয়েদের মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র নিতে বলিতেন। জনৈক ভক্তের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলে ভক্তটি মহারাজের কাছে দীক্ষার কথা বলায় তিনি বিরক্ত হইলেন ও ভিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পর সেই ভক্তের বাড়ীতে খুব বিপদ হইয়া গেল; তখন মহারাজ বলিলেন, "যদি মায়ের কাছে দীক্ষার কথা বলতাম তা হলে

আমার উপর দোষ পড়ত, ত্যাগীর নিকট দীক্ষা নিলে খুব সাবধানে থাকতে হয়।”

সাধুদের ঈশ্বরে নির্ভর সম্বন্ধে তিনি খুব উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন—“ভগবানের উপর নির্ভর করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। নির্ভর কি অমনি হয়? কত সাধু-সঙ্গ ধ্যান-জপ করলে তবে নির্ভর আসে! নির্ভরের জন্য কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করে ছিল বলে বেঁচে গেল। শশী মহারাজের গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। কলকাতা থেকে গরমের দিনে এক পয়সার বরফ নিয়ে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। গুরুভক্তিতে এত গরমেও বরফ গলেনি। স্বামীজী বলেছিলেন—‘শশী আমার জন্য সব করতে পারে’। তিনি গুরুভাইদের জপ-ধ্যান করার সুবিধা করে দিয়ে নিজেই সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করতেন।”

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ ধ্যান-জপের কথা খুব বলিতেন। গৃহস্থদের বখেড়া অনেক। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা বেশী; তবু তারা যতটুকু করে ততটুকুই ভাল। ত্যাগীরা বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে; সে জন্য তাদের সব সময় ভগবানের স্মরণ মনন করা উচিত। ধ্যান-জপ না করে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন, ইহাতে অপকার হয়। জনৈক সাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—সন্ন্যাস নিয়েছ ত কি হয়েছে? সন্ন্যাসীরও বাপ-মায়ের সেবা করা

উচিত। বাপ-মা কত বড় গুরু! সাধুর বেশী ঘোরাঘুরি ভাল নয়, আমাদের ঠাকুর কেবল বৈদ্যনাথ, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ছাড়া অন্য তীর্থে যাননি। বেশী ঘোরাঘুরিতে মন উচাটন হয়। তার চেয়ে একস্থানে স্থিরভাবে ভগবানকে ডাকা ভাল। আমারও মধ্যে মধ্যে ঘোরতর ইচ্ছা হত। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু দেখলে বুঝতে পারতেন। তাই বলতেন— 'যা, কলকাতায় ঘুরে আয়।' কলকাতায়ও কিন্তু মন বসত না। ঠাকুর ছাড়া এত স্বাধীনতা কোথায় পাব?

"বাপ মায়ের ছেলেমেয়ের নিকট খুব সাবধানে থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের নকল করে। বাপ-মা মানুষ না হলে ছেলে মেয়ে কখনও মানুষ হতে পারে না। ছেলে মেয়েকে লেখাপড়ার সময় দেখাবে যেন শত্রু। অন্য সময় স্নেহ করবে।"

লাটু মহারাজের অসুখের সময় অনেক ভক্ত তাঁর শ্রীচরণ-সমীপে আসিত। আমরা তাহাদিগকে বাধা দিলেও তিনি শুনিতেন না। তিনি বলিতেন—"দুটো ভগবানের কথা বলে আনন্দ পাই, এতে বাধা দিও না। শরীর চিরস্থায়ী নয়, দুদিন বাদে ছুটে যাবে। তা বলে তোরা দুঃখ করিস নে। ভগবানের কথা শুনতে ক'টি লোকের আগ্রহ হয়? এতে ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ না হলে ইহা অসম্ভব। সৎসঙ্গ বহু ভাগ্যে হয়। সৎসঙ্গের মহিমা প্রথম বোঝা যায় না, উহা একটু একটু করে বাড়ে, শেষে

বুঝতে পারবে।"

লাটু মহারাজ পায়খানার মধ্যে আপন মনে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "পবিত্র হও, পবিত্র হও। ভক্তের সংযম বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ এবং জপ-ধ্যানেও সংযম আসে।" কেহ অন্যায় কাজ করিয়া পা ছুঁইতে যাইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং সব সময় ছুঁইতে দিতেন না। বলিতেন—"ছুঁয়ে শালারা আমার অসুখ করিয়ে দিয়ে গেল।"

* * *

আমি নিবেদিতার ভক্তি পরীক্ষার জন্য চা খাবার সময় 'ম্লেচ্ছ ছুঁয়ো না' এই সব বলতাম, সে তাতে বিরক্ত হতো না। স্বামীজীর কৃপায় সে কত বড় কাজ করে গেল! তার শরীর খুব অসুস্থ, টেলিগ্রাম এলো। আমি গণেনকে বললাম—শীঘ্র দার্জ্জিলিং চলে যাও। নিবেদিতা গণেনকে খুব ভালবাসত। গণেন গেলে পর নিবেদিতার শরীর যায়। স্বামীজী প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে আসলে রামলাল দাদা স্বামীজীকে মান্য করে কথা বলাতে এবং 'আপনি অমুক করেছেন, তমুক করেছেন' এই সব বলাতে, স্বামীজী দাদাকে বললেন, "দাদা এত 'করছেন—চেন' লাগাচ্ছেন কেন। আমি সেই বিলে আছি।" 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই বলে ভক্তির সহিত প্রণাম করলেন।"

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামলাল দাদাকে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন। ভক্ত তাঁকে আদর করেননি। এমন কি,

পান, এক ছিলিম তামাকও দেননি। ঠাকুর বললেন—'তোকে এরূপ করল কেন?' রামলালদা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে।' ঠাকুর কিন্তু বললেন—'না, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া উচিত। তার উপর আমার ভাইপো, ব্রাহ্মণ-শরীর—মান্য করা উচিত ছিল। তা না হলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন।'

"দুটো কড়া কথা কেউ বললে গায়ে কি লেগে থাকে? একটা শব্দ বই ত না। কিছু মনে করতে নেই। ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। সাধুদের বলতেন—'উপলক্ষ্য ভুলিস না। সৎলোক উপলক্ষ্য ভুলে যায় না। তা না হলে দুর্দ্দশায় কষ্ট পাবে'।"

* * *

শশী মহারাজ মাদ্রাজ হইতে মহারাজের জন্য ভাল ভাল আম পাঠাইয়া দিতেন। একবার লাটু মহারাজকে সদলবলে মাদ্রাজে শ্রীরামেশ্বর-দর্শনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন, "তোর সব খরচা আমি দেব।" কিন্তু মহারাজের নানা কারণে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। লাটু মহারাজ স্বামীজীর নীচেই শশী মহারাজের ভালোবাসার স্থান দিতেন।

* * *

লাটু মহারাজ জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, "ও সন্ন্যাস নিয়েছে তো কি হয়েছে? দুটো শিং গজিয়েছে?

মার (গর্ভধারিণীর) সেবা করা উচিত। মা দুঃখ করলে ক্ষতি হয়। আমাদের ঠাকুর বৃন্দাবনে থাকতে পারলেন না। সব ঠিক ছিল। কিন্তু মায়ের কষ্ট হবে বলে চলে এলেন। এসব আদর্শ ভুললে চলবে না।"

* * *

জনৈক ভক্ত অফিস হইতে আসিয়া মহারাজের কাছে থাকিতেন। তাঁহার পরীক্ষা অতি নিকটে। পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই। পরীক্ষার আগের দিন ভক্তটিকে মহারাজ বলিলেন, "বইটই একটু দেখতে পারিস?" ভক্তটি বলিলেন, "তা হয়ে ওঠে না।" ভক্তটি সেবার লাটু মহারাজের কৃপায় পাশ হইয়া গেলেন। মহারাজ সদাগরী অফিসের চাকুরি পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, "কোন pension-এর ব্যবস্থা নেই, গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে কেমন আছে! বুড়ো বয়সে কোন ভাবতে হবে না। খাওয়া পরার ভাবনা না থাকলে শ্রীভগবানের নাম বেশ করা যায়। ৺কাশীতে দেখছি যতো পেন্সন-হোল্ডারের দল বসে বসে বাজে গল্পে সময় কাটাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এরকম করলে ভগবানের কাছে দোষী হতে হয়।"

* * *

একদিন দেখিতে পাইলাম মহারাজের শরীর সব লাল হইয়া গিয়াছে, মহাবীরের মতো শুইয়া আছেন। তাঁহার শরীরে মহাবীরের ভাব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব

যে না দেখিয়াছে সে আর বুঝিবে কি ?

কোন ভক্ত মহারাজের শ্রীচরণদর্শনে আসিলে তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিতেন। আবার যাহার আধার খুব ভাল তাহাকে পুনরায় আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। যদি কোন ভক্ত আসিত এবং তাহার আধার ভাল নয় আগে টের পাইলে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া থাকিতেন। ভক্তটি কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে চলিয়া যাইত। ভক্তটির কথা মহারাজকে বলায় বলিতেন, "দিক্ করতে এসেছিল, কে বৃথা energy (শক্তি) ব্যয় করে ?" জনৈক ভক্ত ঠাকুরের ভোগের আগে আমরা ক'জন আছি এবং কি কি জিনিসপত্র লাগিবে এই হিসাব করায়, মহারাজ খুব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগ হল না, আর তোরা আগে থেকে হিসেব করছিস ? এ খুব খারাপ। বাইরের দিকটায় বেশী ঝোঁক দিলে ঠাকুরসেবায় ত্রুটি হয়।"

* * *

লাটু মহারাজ নৌকায় চড়িতে ভয় পাইতেন। বোধ হয় সাঁতার জানিতেন না বলিয়া তাঁহার এই ছেলেমানুষি। নইলে তাঁহার আবার ভয় কি ?

* * *

লাটু মহারাজের কাছে জনৈক ভক্ত রোজ সন্ধ্যার সময় আসিতেন। কিছু খাবার আনিয়া বলিতেন, "প্রসাদ করে দিন বাবা।" দরদীর প্রাণ—খুব বুঝিতেন। না খাইলে

পাছে ভক্তটি মনে ব্যথা পায় এ বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখিতেন।

*　　*　　*

গীতা-ভাগবত-পাঠ শোনাইলে, মহারাজ বলিতেন, "লোককে শোনাচ্ছি এই ভাব আনা খুব খারাপ। শ্রীভগবানকে শোনাচ্ছি এই ভাবে ভাগবত-পাঠ শোনালে কর্ম ক্ষয় হয়, এবং অহঙ্কার অভিমান নাশ হয়।" তাঁহার ভাব ছিল, "ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা করবে তাতেই অহং নাশ হবে।"

*　　*　　*

সেবাশ্রমের জনৈক সাধুকে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তুমি ছত্রে একবেলা ভিক্ষা কর, রাত্রে আমার নিকট থাকবে। তুমি আমার কাছে থেকে সাধন-ভজন কর।" ঐ সাধুটি তখন নানা কারণে থাকিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু সাধুটি দুঃখ করেন। তবে মহারাজের শরীর যাইবার আগে কয়দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছিলেন। যখন মহারাজের শরীর যায় এই সাধুটি কাছে ছিলেন। তিনি হরি মহারাজকে খবর পাঠাইলেন। হরি মহারাজ তখনই চলিয়া আসিলেন ও গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন যে, শরীর সামান্য গরম আছে। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরি মহারাজ লাটু মহারাজকে বড় শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন এবং মাঝে মাঝে আসিতেন। লাটু মহারাজ আমাদের কথায় কথায় বলিতেন, "হরি মহারাজের ভাইরা আমাকে

খুব গালাগালি দিতেন। আবার যখন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে আমেরিকায় গেলেন তখন তাঁরা আরও চটে গেলেন।" লাটু মহারাজের প্রেরণাতেই অনেকটা হরি মহারাজ গৃহ-ত্যাগ করেন।

"শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের খুব সেবা করেছেন। আমরা তখন বাইরে বাইরে থাকতুম। আর আমার স্বভাবই ছিল অন্য ধরনের। মেয়েদের, মায়েদের হাঙ্গামা পোয়াতুম না। মেয়েদের, মায়েদের মন যোগানোর ধৈর্য ছিল না বাপু! আমি শরৎ মহারাজকে বলেছিলাম তুমি তো শ্রীমায়ের অনেক সেবা করেছো। তিনি যাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেন সেই পারে। এখন তাঁর দয়ায় তোমাদের মহিমা বুঝতে পারছি। আগে কি আর আমরা সেটা বুঝতে পারতুম? দেখা হলে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।" এই সব কথা পত্রে জানাইয়াছিলেন। মহারাজ রাত্রিতে আদৌ ঘুমাইতেন না। হঠাৎ ঘরে কেহ গেলে বলিতেন, "কে রে?" আর একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে **watch** করিস না। আমার যা খুশি তাই করবো। ইচ্ছা হলে ধ্যান-জপ করবো, না হলে নাই করবো, তাতে তোর কি?" এ ভাব কি সহজে বোঝা যায়? সাধক ছাড়া ইহার মর্ম আর কে জানিবে?

* * *

মহারাজ ৺বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার প্রসাদ খুব ভক্তিভাবে

গ্রহণ করিতেন। কোন ভক্ত ৺কাশীতে আসিলে ৺অন্নপূর্ণার প্রসাদ আনাইয়া দিতেন। ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ পাইয়া মহারাজ বলিতেন, "৺বিশ্বনাথ নিজে মা অন্নপূর্ণার প্রসাদ খান। ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ হয় মোট চাল আর রুটির।" অন্নকূটের প্রসাদ ভক্তদের ধারণ করিতে বলিতেন। বলিতেন, "অন্নকূটের প্রসাদ ধারণা করলে অন্নবস্ত্রের কষ্ট থাকে না।" অন্নকূটের প্রসাদ ডাকে পার্শেল করিয়া আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন। ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ তাঁর অতি প্রিয় ছিল।

* * *

লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক অদ্ভুত সেবক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় রত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সরল বালকোচিত স্বভাব ছিল। প্রতিদিন প্রাতে তিনি প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখই দর্শন করিতেন, আর কাহাকেও দেখিতেন না। ছেলেমানুষের মত তাঁর ভয় হইত কি জানি পাছে অপর কাউকে দেখিয়া ফেলেন, তাই একদিন তাঁকে দেখিতে না পাইয়া দুটি চোখ ঢাকিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "কোথায় আপনি, কোথায় আপনি।" তখন ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে ঝাউতলায় গিয়াছেন, সুতরাং লাটু জবাব না পাইয়া আবার দ্বিগুণ চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'সারাদিনটা আমার বিল্‌কুল খারাপ যাবে যদি আগে আপনার দর্শন না পাই।' শ্রীশ্রীঠাকুর তখন শুনিতে পাইয়া

দূর হইতে বলিলেন, "যাচ্ছিরে যাচ্ছি, রোস্।" কিছু পরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ঢুকিলেন, তখন লাটু চোখ মেলিয়া তাঁর শ্রীমুখখানি দেখিয়া আনন্দিত মনে তাঁর চরণে প্রণত হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসানে তাঁর প্রাণপ্রিয়, সুতরাং সকলের শ্রেষ্ঠ, আচার্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের লইয়া যথাবিধি বিরজা হোম করেন এবং সকলকে সন্ন্যাস নাম দেন, তখন পিতৃশ্রাদ্ধকালে সরলপ্রাণ শ্রীলাটু যেন তাঁর পিতৃপুরুষগণকে সমাগত দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আয়, আয়, বইঠ্, বইঠ, পূজা লে, পিণ্ডা লে।" এই সময়েই শ্রীলাটুর এই অদ্ভুত ভাব, ধ্যান-ধারণায় অদ্ভুত নিষ্ঠা, বাল্যকাল হইতে অদ্ভুত ধর্মানুরাগ, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বড় প্রীত হইয়া আচার্যপ্রবর স্বামিজী তাঁর সন্ন্যাসের নাম রাখেন, "শ্রীঅদ্ভুতানন্দ।" বস্তুতঃ শ্রীমদ্ অদ্ভুতানন্দের জীবন ও আচরণ সকল বিষয়েই অদ্ভুত!

* * *

সুখ দুঃখই মায়া। ভগবানের শরণ লইলে সুখ দুঃখের হাত হইতে বাঁচা যায়। লাটু মহারাজ বলিতেন, "কি বেঁচেই গেছি উঃ। হাসতে কাঁদতে জীবনটা যেত।" এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাই কেবল ভাব বা কৈবল্য অবস্থা।

তিনি রাত্রিতে মোটেই নিদ্রা যাইতেন না। নিদ্রায়

তাঁর ভারী ভয় ছিল। "কত করে এই দুর্লভ জিনিস (পরমার্থ ধন) লাভ হয়েছে, অচেতন অবস্থায় যদি কেউ চুরি করে" এই ভয় সর্বদা তাঁহার ছিল। রামপ্রসাদের গানেও আছে :—

"জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেও নারে ভোলা মন।
ঘুমেতে হারাবে রতন।
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন,
তখন আসিবে নিদ্, চোরে দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন।

লক্ষ্মণ বনবাসকালে চৌদ্দ বৎসর নিদ্রা যান নাই। অর্জুন "গুড়াকেশ" অর্থাৎ জিতনিদ্র। লাটু মহারাজ, কি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁর দেহত্যাগের পরে, আজীবন সারারাত্র জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন, এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই কঠোর অভ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন।

শেষ জীবন তিনি বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে অতিবাহিত করিবার জন্য কাশীতে গমন করেন, তথায় কয়েক বৎসর বাস করিয়া দেহরক্ষা করেন। তথায় তিনি সর্বদাই যেন একটা ভাবে বিভোর থাকিতেন। ভগবদ্-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ তাঁর নিকট বড় একটা শোনা যাইত না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ও বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। স্নান আহারাদি দৈহিক ব্যাপারে তাঁর কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

* * *

কাহারও ক্রোধ হইলে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ওকে ছুঁয়ো না, ও চণ্ডাল হয়েছে, চণ্ডাল ছুঁলে নাইতে হবে।" কেহ রাগের বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় করিলে তাহাকে তখন কিছু বলিতেন না, পরে বুঝাইয়া বলিতেন, "রাগের সময় বললে কোনও ফল হয় না, বৃথা energy (শক্তি) ক্ষয় হয়, পরে রাগ থামলে বুঝিয়ে দিলে ভাল কাজ হয়।" সাধুরা অন্যায় কাজ করিলে বলিতেন, "ওরে তোরা আমার কাছে থেকে অন্যায় কচ্ছিস, এতে যে পরমহংসদেবের বদনাম হবে। লোকের মনে সন্দেহ হবে যে এরূপ বুঝি তাঁর শিক্ষা ছিল। তোদের সৎ, পবিত্র দেখলে লোকে বুঝবে যে এরা তাঁর হুকুম মানছে।" একদিন বলিয়াছিলেন, "তোদের হাতে টাকা নেই বেঁচে গেলি। টাকা থাকলে প্রায়ই বদ মতলব আসে। টাকাকড়ি থাকবে অথচ সৎবুদ্ধি হবে, এ ঠাকুরের বিশেষ দয়া।"

* * *

জনৈক ভক্ত কাশীতে তাঁহার পিতামাতার কাজ পুরোহিত দ্বারা করাইয়াছিলেন। এই ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তুমি যখনই কাশীতে আসবে, ঐ

পুরোহিতকে যথাসম্ভব প্রণামী দিও। ইনি কাশীতে তোমার বাপ-মায়ের কাজ করেছেন।"—অপর একজন ভক্তকে লাটু মহারাজ ওকালতি করিতে নিষেধ করেন এবং কাশীতে একটি স্কুলের শিক্ষকের কাজ ঠিক করিয়া দেন। কিন্তু ভক্তটি বেতন কম শুনিয়া বলিলেন, "আমার এত বড় সংসার, এই কম মাহিনাতে চলবে না।" তখন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি ওকালতি করো।" কিছু দিন পরে এই ভক্তটি অপর একজন উকিল সহ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি খুব খুশী হইলেন। নবাগত উকিলকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "এ একেবারে নতুন, একে বেশ ভাল করে উকিলের কাজ শিখিয়ে দাও।"

জনৈক ভক্ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া কাশীতে আসেন। হঠাৎ একদিন লাটু মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাজ তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন এবং তিনি তিনটি পাশ করিয়াছেন শুনিয়া খুশী হইলেন ও আদর যত্ন করিলেন। দেশে গিয়া ভক্তটি মহারাজকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ ভক্তটিকে আর টাকা পাঠাইতে বারণ করিয়া তাঁহার বাপ-মায়ের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। লাটু মহারাজ বলিতেন, "দেবসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার জন্য পয়সায় চারটি সন্দেশ, আর মেয়ের জামাই আসলে চার

পয়সার একটি সন্দেশ কিনলে দেবসেবা হয় না।"

*   *   *

লাটু মহারাজ মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা মাকে মান। মাকে আদর্শ কর। কেবল মুখে মা মা বললে হবে না।" —কোন ভাল জিনিস আনিলে, তিনি তা সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। লেখককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "লাটু কি কম গা? সে সময় লাটু আমার কত কাজ করত। অন্য ছেলেরা আমার সামনে আসতে পারত না।" আমি মাকে বলিয়াছিলাম—"মহারাজের মেজাজের ঠিক নেই। তাঁর কাছে থাকা কঠিন।" তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "লাটুর সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।" আমার সন্ন্যাস লইবার পর শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন করিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হয়। এবং মায়ের নিকট যাইবার জন্য লাটু মহারাজের অনুমতি চাই। মহারাজ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মার কাছে গেলেই কি সব হয়ে গেল।" [তিনি পুরুষদের মায়ের কাছে যাওয়া খুব পছন্দ করিতেন না। মেয়েদের যাইতে বলিতেন।]

*   *   *

লাটু মহারাজ সকলের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। একদিন একজন ভদ্রলোক অতি উপাদেয় খাবার আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না এবং কাহাকেও খাইতে দিলেন না। এবং অনেক ভক্তের আনীত সামান্য

জিনিস, তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থাতেও গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি এরূপ কেন করেন?" তিনি খুব তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "সাধু হলে বুঝতে পারবি।" এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, কাহারও প্রদত্ত জিনিস গ্রহণ করিলে মন বেশ আনন্দিত হয়, আবার কাহারও কোন জিনিস গ্রহণ করিলে মন নীচু হয়।

* * *

লাটু মহারাজ বলিতেন,—"অন্তরে শ্রদ্ধা নেই শুধু বিশ্বনাথপূজায় কিছু হবে না। কাশীবাস ও কাশীপ্রাপ্তি বহু ভাগ্যে ঘটে। দেখা যায় কাশীবাস করছে, হঠাৎ চলে গেল ও সেখানে মৃত্যু হল। কেউ হঠাৎ কাশীতে এসে কাশীপ্রাপ্ত হল।"

জনৈক ভক্ত বাড়ী যাওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, এখন যাই আবার আসব।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আবার আসা হবে কি না হবে, কাশী ছেড়ো না"।

লাটু মহারাজ কাশীতে থাকিয়া ব্যবসা করিতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন, "ব্যবসা করলে মন কোথায় চলে যায়—এতে কি কাশীবাস হয়? বরং যারা অন্যত্র থেকে কেবল কাশীর চিন্তা করে তাদের সদ্গতি হবে। অবতার পুরুষ মাত্রই কাশী এসেছেন। গঙ্গা আছেন এজন্য কাশীর মাহাত্ম্য আরও বেশী। কাশীবাস করলে অন্য তীর্থের প্রয়োজন হয় না। কাশীতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন।"

তিনি বেশী তীর্থভ্রমণ পছন্দ করিতেন না, বলিতেন, "আমাদের ঠাকুর কেবল নবদ্বীপ, বৈদ্যনাথ, কাশী ও বৃন্দাবন দর্শন করেছিলেন।" কাশীতে কেহ অন্যায় করিলে বলিতেন, "কেবল কাশীর চিন্তা কর, তবে স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পারবে।" সন্ধ্যা হইলে অন্য প্রসঙ্গ পছন্দ করিতেন না, তখন ধ্যান জপ করিতে বলিতেন। সন্ধ্যার সময় আমি একবার কোনও ভক্তের সহিত গল্প করিতেছি। পরে লাটু মহারাজের কাছে যাইলে ধমক দিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার সময় জপ করতে হয়।" একদিন জনৈক ভক্ত রাস্তায় অসৎ চিন্তা করিয়া আসিলে তিনি কিছুতেই তাঁহাকে পা ছুঁইতে দিলেন না। আমার সংশয় হয়েছিল। পরে ভক্তটি এই কথা প্রকাশ করেছিলেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরুর সঙ্গ না করলে কিছু বুঝতে পারা যায় না। গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।" আবার কখনও বা বলিতেন, "কারও কারও বা খুব বেশী দিন গুরুর কাছে থাকলে গুরুর উপর সংশয় হয়।"

* * *

আমার পূর্বাশ্রমের জনৈক আত্মীয় কাশীতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার নাতিটি মারা যাওয়ায় শোকে বড় কাতর হইয়া পড়েন। তিনি কিছুদিন মহারাজের সঙ্গ করেন এবং তাঁহার কথামত তিলভাণ্ডেশ্বরে একমাস ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন। সাধু, ভক্ত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনও করান। তাঁহাকে

লইয়া আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন, "তোমার যাওয়া খুব দরকার।" কলিকাতায় যাইয়াই হঠাৎ আমার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মনে হয় এবং পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুই কাশীতে গিয়ে লাটু মহারাজকে 'নমো নারায়ণ' করবি।" আমি বলিলাম যে তাহা পারিব না। কিন্তু কাশীতে পৌঁছিয়া লাটু মহারাজের ঘরে ঢুকিতেই তিনিই আমাকে 'নমো নারায়ণ' করিলেন। তখন আমার মহারাজের কথা মনে হইল। পরে তিনি সাধন-ভজন ও ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বলিয়া আমাকে খুব উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "এখন কন্‌খলে যাও, সেখানে থেকে সাধন-ভজন কর। বর্তমানে তোমার কাশীতে থাকা সুবিধা হবে না।" আমি হৃষীকেশ যাইয়া শ্রীশ্রীলাটু মহারাজকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "লোক-দেখান চিঠি-পত্র দেওয়ার কি দরকার? ভগবানকে পাওয়ার জন্য কর্ম কর।" সন্ন্যাস সম্বন্ধে আমাকে একজন আপত্তিকর কথা বলায় আমার দুঃখ হইল। লাটু মহারাজ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ও মায়ের নিকট হতে মন্ত্র পেয়েছে, আবার মহারাজ সন্ন্যাস্ দিয়েছেন, ওর প্রাণে দুঃখ দিলে তার কি গতি হবে তা ভগবানই জানেন।"

লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "স্বাবলম্বী

না হলে ছেলেদের বিয়ে দিও না। বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আগে বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতেন। কোন কোন বাপ-মা ছেলেদের বলেন—তোমাদের সামান্য আয়, বুঝে সংসার করবে। আমরা সংসারে থেকে দুঃখ পেয়েছি। এই বলিয়া তিনি সংসারের অনেক দোষ দেখাইয়া দিতেন।"

অনেক লোককে ব্যবসা করিতে লাটু মহারাজ উৎসাহ দিতেন এবং বলিতেন, "ব্যবসা জানা দরকার। মান অপমান একবোধ না হলে ব্যবসা করা যায় না। এই জন্যেই উন্নতি হয় না। সব সময় চাকরদের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। তারা কাঁচা পয়সার মায়া ছাড়তে পারে না। ব্যবসায় খুব খাটতে হয়।"

*　　*　　*

লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন—"সংস্কার যাওয়া খুব কঠিন—ভগবানের কৃপা ভিন্ন যায় না। অনেক বড়-লোকের ছেলে কোনও অভাব নেই, তবুও চুরি করে। পূর্ব-জন্মের সংস্কার। সেই জন্যেই ত জন্মান্তর মানতে হয়। শাস্ত্রে বলেছে—জন্মগ্রহণ করে ভাল কাজ করলে মঙ্গল হয়। ভায়ে ভায়ে মিল থাকা খুব দরকার। সকলে সমান রোজগার করতে পারে না। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না।" যে বেশী রোজগার করিতে অক্ষম, তাহাকে বলিতেন, "এ সংসার ক'দিনের জন্য। বেশী ভাবিস না, কোন রকমে

সংসার চলে গেলেই হল।”

*　　*　　*

সাধুমহাপুরুষদের কেবল দর্শন করিলেই যদি সকলেই ‘মানহুঁশ’ হয়ে যায়, তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকত না, একদিনেই দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি হয়ে যেত, ষাট হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করবার কি প্রয়োজন ছিল? পরমহংসদেবকে ও স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল, কিন্তু তাঁহাদের মহৎ সেবাব্রতে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছেন এবং এখনো পর্যন্ত দেশ-বিদেশে তাঁদের পতাকা বহন করে ‘জীবসেবা’ মন্ত্রের সাধনে অম্লানবদনে প্রাণপাত করছেন, তাঁদেরই জীবন সার্থক।

*　　*　　*

লাটু মহারাজের গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ভালবাসা ছিল অগাধ। আলমবাজার মঠে যখন শ্রীকালী মহারাজের (শ্রীঅভেদানন্দ স্বামীর) অসুখ (guinea worm) হয়, তখন তিনি তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। সংযমও ছিল তাঁর অপরিসীম। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল। একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ কিরূপে উহা পালন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর কাশ্মীরভ্রমণের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে গিয়া বোটে (নৌকাতে) থাকিতেন। ঐ বোটের মাঝির একটি

মেয়ে দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল, সে তার বাবার সঙ্গে বোটেই থাকিত। লাটু মহারাজের সহিত একটু রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী সেই মেয়েটিকে একদিন বলিলেন, "ছাখ, এই পানটি ওধারে যে সাধুটি বসে আছে, তুই তার হাতে দিয়ে আয় দেখি।" বালিকাটি স্বামীজীর এই কথায় খুশী হইয়া লাটু মহারাজের নিকটে গিয়ে তাঁকে পানটি দিতে গেল। কিশোরীর পান দিবার আগ্রহ দর্শনে লাটু মহারাজ প্রথমে বিরক্ত, তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি এতদিন বোটে রয়েছি, একদিনও ত এই মেয়েটি আমায় পান দিতে আসেনি, আজই বা আসে কেন? এ দেখছি নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের কারসাজি, বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ বোটে আর থাকা হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই উচিত। যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাটু মহারাজ জলে ঝাঁপিয়ে পড়িলেন,—ডুবিয়া যাইবেন, কি ভাসিয়া যাইবেন সে চিন্তা তাঁর একেবারেই নাই! স্বামীজী আড়াল হইতে লাটু কি করে এতক্ষণ দেখিতেছিলেন। তিনি যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়িবেন—এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি তাড়াতাড়ি মাঝিমাল্লাদের ডাকিয়া লাটুকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ ত কোনো মতেই বোটে উঠিতে চান না। শেষটা বহু সাধ্য-সাধনার পর স্বামীজী লাটুকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন।

স্বামীজী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে খেতড়ীতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহার শিষ্য খেতড়ীরাজের নিকটে অবস্থান করেন। সেই সময় লাটু মহারাজও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ঐ রাজার ধারণা ছিল যে, স্বামীজীর গুরুভাই লাটু মহারাজও ইংরাজী ভাষা জানেন। তাই তিনি একদিন একটা বড় globe-এর (গোলাকার মানচিত্রের) সামনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেই মানচিত্রে অঙ্কিত কোনো এক দেশের বিষয় ইংরেজী ভাষায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ ত নিরুত্তর, কেবল দাঁড়াইয়া মানচিত্র দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামাজী কিছু তফাতে বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাটু মহারাজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কত কথা এমনভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনিও খুব খুশী হইয়া গেলেন অথচ রাজা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে লাটু মহারাজ ইংরেজী জানেন না। স্বামীজী লাটু মহারাজের মান রাখিলেন। এই সামান্য ঘটনা হইতেই লাটু মহারাজের প্রতি স্বামীজীর প্রাণে কতখানি ভালবাসা ছিল তাহা বুঝা যায়।

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ বলেন, লাটু মহারাজ যে আমাদের গুরুভাই ছিলেন, ইহা যথার্থই আমাদের গৌরবের বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথা বলিতে বলিতে লাটু মহারাজ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। একবার তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "ত্যাখ, প্রথমবার বিলাত হতে এসে একদিন সেই সাবেক বরাহনগর মঠের চালে মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, 'ভাই লাটু! আমি সেই নরেন, তুইও যেমন ভিখারী, আমিও সেই রকম ভিখারী সন্ন্যাসী, গুরুভাইদের থাকবার জন্য মঠ স্থাপন করতে হল, আমার জন্য কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই এত বড় ব্যাপার হয়ে গেল। আজ তোর কাছেই ভিক্ষা করা যাক, আয় দুজনে এক সঙ্গে খাই।' আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম, স্বামীজীও আমার সঙ্গে একপাতে খেতে বসে গেলেন, তাতে আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং, আমার প্রাণ হরষিত হল।"

* * *

১৯১৩ সনে ৺কাশী হইতে ১০০০।১২০০ মাইল দূরস্থিত রেঙ্গুনপ্রবাসী এক ২৪।২৫ বৎসরের যুবক ৺কাশীতে জলবায়ু-পরিবর্তনের মানসে এক ভক্তের নিকট পরামর্শ চান। ৺কাশীতে ঘর ভাড়া করিবার সামর্থ্যাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে একমাস থাকিবার সুবিধা যাহাতে করা যায় সেজন্য উক্ত ভক্তটিকে বিশেষ অনুরোধ করিতে জানাইলেন। ভক্তটি বলিলেন অদ্বৈত আশ্রমে থাকার

আবশ্যক নাই, আপনাকে অন্য এক মহাপুরুষের আশ্রমে পাঠাইব। সেখানেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হইবে, আপনার কোন প্রকার খরচ লাগিবে না। সেই মহারাজ আপনাকে দেখিবামাত্রই অপনার ভূত ভবিষ্যৎ সবই তিনি বুঝিতে পারিবেন। যুবকটি তাহা শুনিয়া বলিলেন—"আমার বহু দোষ ত্রুটি আছে, আমি সেখানে যাইব না; আর তিনি কি আমার পিতামাতা-স্বরূপ যে একমাস বিনা খরচে থাকিতে ও খাইতে দিবেন?"

ভক্তটি বলিলেন—তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাইবেন যে তিনি কিরূপ স্নেহপরায়ণ। তথাপি যুবকটি উক্ত মহাপুরুষের আশ্রয়ে যাইতে সাহসী না হওয়ায় ভক্তটি বলিলেন—আমি আজই তাঁহার নিকট আপনার থাকার জন্য পত্র লিখিতেছি, উত্তর আসিলেই সব বুঝিতে পারিবেন। উক্ত মহাপুরুষজী পত্র পাওয়া মাত্রই পত্রোত্তরে জানাইলেন, যুবকটিকে সত্বর পাঠাইয়া দাও।

পত্রোত্তরে মহারাজের করুণার বিষয় অবগত হইয়া অবশেষে যুবকটি তথায় যাইতে রাজী হইলেন। এই ১০০০। ১২০০ মাইল দূর হইতে ৺কাশী পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইয়াছিল তাহা সত্যই কল্পনাতীত। ৺কাশী স্টেশন হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আনিয়া মহারাজের আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেন। বহুদিন পরে দূর দেশ হইতে হঠাৎ ছেলে বাড়ীতে

আসিলে আনন্দে অধীর হইয়া মা যেমন বলিয়া থাকেন, 'হ্যারে! খোকা এসেছে, তোরা দেখবি আয়', উক্ত যুবকটি মহারাজের আশ্রমবাড়ীর সদর দরজার কড়া নাড়িতেই আনন্দে উচ্চকণ্ঠে মহারাজ তাঁহার সেবককে ডাকিতে ডাকিতে বলিতে লাগিলেন—"ওরে! শীগ্‌গীর আয়, রেঙ্গুনের রামেশ্বর এসেছে।" যুবকটি মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন: "রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি ত! খাওয়া ও ঘুমের কোন অসুবিধা হয়নি ত?' যাত্রাপথে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে আহার-নিদ্রার যে সুবিধা হইয়াছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের নিকট হইতে যে ভালবাসা ও যত্ন পাওয়া গিয়াছে, অর্থের বিনিময়ে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। মহারাজের দয়াই যে এই অভূতপূর্ব অযাচিত আদর-যত্ন ও স্নেহলাভের কারণ তিনি তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ৺কাশীযাত্রাপথে যে অভাবনীয় সুখ সুবিধা লাভ হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানাইলাম। রেঙ্গুন হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া তিন দিন খুব আরামেই সমুদ্রবাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। তাহার পর সন্ধ্যা ৭টায় কলিকাতা হইতে মেলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া সহযাত্রী একটি ছেলের সাহায্যে সম্ভবমত আরামে ও আনন্দেই অতি প্রত্যূষে ৺গয়াধামে আসিয়া পৌছিলাম। মাতাপিতার কার্যের জন্যই গয়ায় অবতরণ। সেইকালে

গয়ায় পাণ্ডাদের খুব অত্যাচার চলিতেছিল। কিন্তু আমাকে পাণ্ডাদের কবলে পড়িতে হয় নাই। গয়াতে **P. W. D.**র একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর নিকট একটি পরিচয়পত্র নিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি গয়ার বড় পাণ্ডার কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই ছেলেটি গয়ায় শ্রাদ্ধাদি কার্য করিবে। শুদ্ধরূপে কার্য করাইয়া দিও। টাকা পয়সার জন্য কোনরূপ চাপ দিবে না।" তখন বেলা ৮টা। সেইদিন একাদশী ছিল। উক্ত ভদ্র মহোদয়ের স্ত্রী আমাকে ভিতর বাড়ীতে ডাকাইয়া এক কাপ চা ও রুটি দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি ছেলেমানুষ, কিছু চা রুটি খাও। না খেলে বেলা ৩।৪টা পর্যন্ত উপোস করে থাকতে পারবে না।"

প্রায় ৩টা ৩২টার সময় শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেই উক্ত ভদ্র-মহিলা আমাকে বাড়ীর ভিতরে ডাকাইয়া নিয়া গরম ভাত ঘৃত খাইতে দিয়া বলিলেন: "বাবা! তুমি বাঙালীর ছেলে, চারটি ভাত না খাইলে তোমার কষ্ট হইবে। রাত্রিতে আমরা একাদশী করিব।" বলা বাহুল্য, আমিও খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাত্রি ৭।৮টার সময় ষোড়শোপচারে লুচি, আলুর দম, তরকারি ও নানাবিধ মিষ্টি সহকারে আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

মাতৃস্থানীয়া এই ভদ্রমহিলার বাৎসল্যপূর্ণ পরিবেশনে আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনি বলিলেন, "মোগলসরাই-এর গাড়ী খুব ভোরে আসে। ৫টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া হাতমুখ

ধুইয়া প্রস্তুত হইবে।" ভোর ৫টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতেই দেখিলাম উক্ত মহিলা আমাকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া গরম লুচি, তরকারি, বেগুনভাজা ও বহুবিধ মিষ্টি খাইতে দিয়া বলিলেন, একটু চা খাও। আমি কুলি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। সে এখনই তোমাকে স্টেশনে নিয়া যাইবে। নানা উপচারসহ চা খাওয়া শেষ হইবার একটু পরেই কুলি আসিল।

কুলির হাতে এক চাঙ্গারিভরতি লুচি, তরকারি, সন্দেশ প্রভৃতি দিয়া কুলিকে বলিলেন, "সাবধানে নিয়ে যাও, দেখো পড়ে না যায়।"

ইহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, বলিলাম, "মা, এইমাত্র তো পেট ভরে খেলাম। এত খাবার আবার কেন দিলেন ?" তিনি বলিলেন, "না বাবা ! মোগলসরাই যেতে না যেতেই ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করবে, স্টেশনে তোমার কষ্ট হবে, কারণ তুমি নূতন লোক।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মা'র পদধূলি নিয়া যাত্রা করিলাম। বাস্তবিক মোগলসরাই পৌঁছাতেই (প্রায় বেলা ১২টায়) এমন ক্ষুধার উদ্রেক হইল যে চাঙ্গারিভরতি সমস্ত লুচি, তরকারি প্রভৃতি নিঃশেষে উদরস্থ করিলাম। তারপর ভাবনা হইল কি করিয়া ৺কাশীর গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইব। ইতিপূর্বে শুনিয়াছি ৺কাশীর একাওয়ালারা নূতন লোক পাইলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং যেখানে সেখানে নামাইয়া দিয়াই

বলে, "এই তোমার গন্তব্য ঠিকানা।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার সম্মুখস্থ এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে আমার শঙ্কার কথা জানাইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম ৺কাশী স্টেশনে তিনি যাহাতে একটি এক্কা ঠিক করিয়া দেন। উক্ত ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন ঠিকানায় যাইবেন? আমি বললাম,—৬৮নং পাঁড়ে হাবলী, স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আশ্রম। তিনি উত্তরে বলিলেন—"হয়ে যাবে।"

তাঁহাকে লইবার জন্য তাঁহার বাড়ী হইতে স্টেশনে গাড়ী আসিয়াছিল। তাহাতে তিনি উঠিয়া আমাকেও ডাকিয়া লইলেন, তারপর তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী আসিলে তাঁহার চাকরের মাথায় আমার বাক্স বিছানা উঠাইয়া দিয়া লাটু মহারাজের আশ্রমের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইভাবে অতি সহজে আমি মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। যথা সত্বর আমার স্নান আহারের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার সেবককে নির্দেশ দিলেন। পর্যাপ্ত আহার সমাপনান্তে তাঁহার পদপ্রান্তে যাইতেই তিনি বলিলেন, "দূর পথ হইতে আসিয়াছ, এখন বিশ্রাম কর, পরে কথা হইবে।" তৎপর দিবস সকালে তিনি তাঁহার সেবক পশুপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামেশ্বর এসেছে, আজ মাছ আনবি।" আমি একটু পরেই মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলাম—"মহারাজ মাছ খাওয়া কি ভাল?" তিনি বলিলেন, "কেন রে মাছ কি

দোষ করল। মাছ খাবি, পান খাবি, তাতে দোষ নেই। ভগবানকে বিশ্বাস করবি, ভক্তি করবি, ভালবাসবি। পরের অনিষ্ট করবি না, নিজেরও অনিষ্ট করবি না। শক্তি থাকলে পরের উপকার করবি। তবেই হলো। তবে জোর করে মাছ ছেড়ে দিবি না। যেমন জোর করে পাঁচড়ার মামড়ি তুলতে নেই, তাতে রক্ত বেরুয়। ঘা শুকুতে দেরী হয়। যখন মন আর খেতে চাইবে না তখন ছেড়ে দিবি।"

আর একদিন মহারাজের আশ্রম হইতে দূরে এক স্থানে যাইয়া বেলা প্রায় ৯টায় কতকটা দুরন্তপনা করেছি ও অন্যায় ব্যবহার করেছি। ১০টার সময় আশ্রমে আসিবামাত্রই আমাকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া নিয়া বসিতে বলিলেন এবং অতি স্নেহ-মাখা স্বরে বলিলেন, "কাশী এসেছ বাঁদ্‌রামি করতে? ৺কাশী এসে এমন করে না।" আমি তো লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, এত দূরের ব্যাপার তিনি এখানে বসিয়া কি করিয়া জানিলেন। তারপর বলিলেন, "যখন অন্যায় বোধ হয়েছে, লজ্জা বোধ হয়েছে, তখন আর কি, এখন যাও।" এমন স্নেহ-মাখা ভর্ৎসনা আমার জীবনে কখনও পাইনি। স্নেহ-মাখা শাসনও যে এত মধুর ও কার্যকরী হয় জীবনে এই প্রথম অনুভব করিলাম।

আর একদিন মহারাজ কয়েকজন ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে,

তোর বক্তব্য কিরে ?” আমি চিরকালই কতকটা নির্বোধ ধরণের ও আত্মগোপনে অক্ষম। কিছু দ্বিধা না করিয়াই বলিলাম, “মহারাজ ধর্মটর্ম কিছু বুঝি না। মাইনে বড় কম।” একথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, “মাইনে কম এটা বুঝিস ; কত মাইনে পাচ্ছিস ?” আমি বলিলাম ৪০ টাকা। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কলিকাতা শহরে কখনও নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছি কিনা। “আজ্ঞে হাঁ, গিয়াছি”—এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, “যখন সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি পরিবেশন করতে আসে তখন দেখেছিস ত ছেলেগুলি ডাকাডাকি করে বলে, “মশায় এখানে দুটো সন্দেশ, এখানে দুটো রসগোল্লা”। কিন্তু যে পরিবেশন করছে তার আক্কেল আছে। যে যেমন খেতে পারবে সে তেমনই দেয়। বেশী দিলে অর্ধেক খাবে, অর্ধেক ফেলবে। আবার কারু কারু পাতে নিমন্ত্রিতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশী বেশী দিচ্ছে, কারণ জানে, এই লোকটি খেতে পারবে, জিনিসটারও সদ্ব্যবহার হবে। হ্যাঁরে, আমরা তো তোদের দিতেই চাই। যদি মোক্ষই দেওয়া যায় তবে ছাই টাকা কি দেওয়া যায় না ? একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “যা, চলে যাবে”। আমার ধন প্রার্থনা উত্তমরূপেই পূর্ণ হইয়াছে। আর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, “অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজের কাছে উপদেশ নিয়ে আয়।” “কর্মফল ভুগতেই হইবে”—তাঁহার উপদেশের এই মর্মকথা। ইহা

শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কর্মফল ভুগতেই হবে ? যিনি কর্মের ফল সৃষ্টি করেছেন তিনি দয়া করলে কর্মফল কাটিয়েও দিতে পারেন না ?"

৺পূজার দিনগুলি আগতপ্রায়, তাই বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তিনি বলিলেন, "কেন রে, ৺কাশী থেকে যা, ৺কাশীর পূজা দেখবি।" "৺পূজার ছুটিতে সকলেই বাড়ী আসবে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবে, তাই বাড়ী যাইতে মন চাচ্ছে"—এই বলিলে তিনি বাড়ী যাইতে অনুমতি দিলেন।

বিগত প্রথম বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে মেসোপটামিয়ায় আমি যুদ্ধে যাই। তথায় ৩।৩½ বৎসর চাকুরির পর ১৯১৮ ইং সনের মে মাসে বাড়ী প্রত্যাবর্তনের পথে মোগলসরাই আসিয়া পূজাপাদ লাটু মহারাজের পদধূলি নিয়া বাড়ী যাইব এই ইচ্ছা হওয়ায় ৺কাশী ৯৬ নং হাড়ারবাগে লাটু মহারাজের আশ্রমে সকাল বেলা প্রায় ৮টার সময় উপস্থিত হই। তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহার সেবক পশুপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে পশুপতি শীগগীর আয়, রামেশ্বর এসেছে।" পথে বিগত রাত্রিতে নিদ্রা হইয়াছিল কিনা ও খাওয়াদাওয়ার সুবিধা হইয়াছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই আমার থাকার ব্যবস্থা করিতে পশুপতিকে বলিলেন ও আমাকে বিশ্রাম করিতে

উপদেশ দিলেন। চা পান করিয়া তামাক খাইতে খাইতে মনে মনে একখানা ধুতি কিনিয়া আনিবার কথা ভাবিলাম, কারণ মিলিটারী পোশাক ভিন্ন অন্য কোনও পোশাক সঙ্গে ছিল না। মহারাজের নিকট যাইয়া যুক্তকরে বলিলাম, "মহারাজ আমি ১০ মিনিটের জন্য বাইরে যাইতেছি। এখুনি আসিব।" মহারাজ ১ মিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার সেবক পশুপতিকে ডাকিয়া আমাকে একখানা ধুতি নামাইয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। আমার অন্তরের কথা কি করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, লোকে আপনাকে দেয়, সেবা করে; আর আপনি কিনা আমাদের দিচ্ছেন।" তিনি বলিলেন, "এ ত তোদের জন্যই রে, আমি এত সব দিয়ে কি করবো?" পর দিবস সকাল ৮।৯টার সময় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ মহারাজ তাঁহার সেবক পশুপতিকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "ডাক শালাকে, ৺কাশী এসেছে; কোথায় সাধুসেবা করবে, না শালা হুমড়ী খেয়ে বসে আছে।" পশুপতি এসে আমাকে বলিল, "মহারাজ আপনাকে ডাকচেন।" ভীত কম্পিত পদে মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "পা টেপ্, সাধুসেবা কর।" এইভাবে কিছুক্ষণ দয়া করিয়া আমার সেবা গ্রহণ করিলেন। তৎপর বৈকালে বিদায় লইবার সময় প্রণাম করিয়া তাঁহাকে আটটি টাকা দিতে

চাইলে তিনি বলিলেন, "দেশে বহু গরীবদুঃখী আছে, তাদের দিয়ে দে। আমার কোনও অভাব নেই। আমাকে তিনিই দিচ্ছেন।" তিনি টাকা কিছুতেই নিলেন না। এই আমার মহারাজের সঙ্গে শেষ দেখা।

* * *

জনৈক ভক্ত বলিয়াছেন—এক সময় লাটু মহারাজ কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে বাস করিতেন। সদরে প্রবেশ করিয়া নীচের তলায় ঘরখানিতে একখানি খাটিয়া বিছাইয়া অধিকাংশ সময় তিনি পড়িয়া থাকিতেন। লোকে মনে করিত তিনি ঘুমাইতেছেন। একদিন বৈকাল বেলায় কিছু মিষ্টান্নাদি হাতে লইয়া বলরাম মন্দিরে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি হাসি মুখে বলিলেন, "কবে এসেছিস? কেমন আছিস?" তখন বেলা অপরাহ্ণ। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথা শুনিতে শুনিতে প্রায় রাত্রি দশটা হইয়া গেল, শেষে দেখিলাম একজন ঘোর মাতাল বগলে একটি বোতল হাতে খানিকটা রাঁধা মাংস লইয়া টলিতে টলিতে সদরে ঢুকিয়া খুব আবদারের সহিত বলিল, "কি গুরুজী, কেমন আছ, বাবা?" লাটু মহারাজ শশব্যস্ত হইয়া অত্যন্ত আপনার লোকের মত তাঁহাকে স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "আরে এস এস। তুমি কেমন আছ? খবর কি?" মাতালটি বলিল, "বাবা, একটু প্রসাদ করে দাও, আনন্দ করি।" তিনি তৎক্ষণাৎ মাংসের বাটি হইতে ২।১

ফোঁটা জিবে ঠেকাইয়া বলিলেন, "খুব আনন্দ কর, খুব আনন্দ কর। বোতলটা এখন থাক, এখন খাবারটা খাও।" তাঁহার নিকট বিদায় লইবার পূর্বে আমাকে শুধু বলিলেন, "দেখ এরা দরদ চায়, দরদ দিতে হবে। তবে সাবধান হতে হবে যেন শেষে মাথায় না চড়ে।"

একদিন একটি ভক্ত তাহার নিকটসম্পর্কীয় কোন ভাইকে সঙ্গে করিয়া লাটু মহারাজের কাছে যান। পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে সাদরে বলিলেন, 'বেশ, বেশ, এস, এস।' সঙ্গীটি মাতৃহীন শুনিয়া লাটু মহারাজ সস্নেহে তাহার সহিত নানা কথাবার্তা ও সদুপদেশ দিতে লাগিলেন এবং প্রসাদ খাইতে দিলেন। পরে ভক্তটির কাছে উক্ত সঙ্গীটি বলিয়াছিলেন—"মহারাজকে দেখবামাত্রই কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করলাম। ফিরে আসবার সময় মনে হলো যদি জীবনে মহান আদর্শলাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় তবে এঁর সঙ্গ ছাড়লে চলবে না।" পরে লাটু মহারাজের পবিত্র সঙ্গ করিতে করিতে দিন দিন তাহার প্রতি যুবকটির ভালবাসা গভীর হইতে লাগিল।

* * *

পূজনীয় গিরিশবাবুর খুব অসুখ। লাটু মহারাজের কাছে যে সব ভক্ত আসিত তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দ্বারা গিরিশবাবুর সংবাদ লইতেন। কেহ কেহ ইহাতে আশ্চর্যও হইত যে তিনি গিরিশবাবুর এত নিকটে বাস

করিয়া একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন না, শুধু লোক মারফত সংবাদ লইতেন। আসল কথা গিরিশবাবুর প্রতি ভালবাসা এত সুগভীর ছিল যে, তাঁহার রোগযন্ত্রণার দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই দূর হইতে খবর লইতেন। গিরিশবাবুর শরীরত্যাগ হইলে তিনি শোকে খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। গিরিশবাবু একসময় কোন কোন ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "লাটু মহারাজের মত নির্মল সাধু অতি দুর্লভ। ওর হাওয়ায় লোকে পবিত্র হবে। লাটু মহারাজের আশীর্বাদে তোমাদের পরম কল্যাণ হবে।"

* * *

পুরাতন বসুমতীর ছাপাখানার কম্পোজিটার ছোকরাদের প্রতি তাঁহার অসামান্য স্নেহ দেখা যাইত। হয়ত সারা দিনের খাইবার জন্য তিন আনা ভিক্ষা করিয়াছেন। তাহারই দ্বারা শিখের দোকানে কিছু হিংয়ের কচুরি তরকারি ক্রয় করিয়া তার অর্ধেক ভাগ ঐ ছোকরা-দের দিয়া বলিতেন, "খা, শালারা, খা। তোদের জন্য কি এনেছি দেখ।"

রাস্তা দিয়া অনেক সময় এইসব ছেলেদের কারো কারো গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে চলিতে দেখা যাইত। এই শ্রেণীর ছাপাখানার ছেলেরা সমাজের চোখে হেয়। একবার একজন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "মশায়,

আপনি মহাত্মা লোক, ঐ-সব বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো নীচ ছোঁড়াদের সঙ্গে অতো গলাগলি মাখামাখি করেন কেন, আপনার কি সঙ্গী জোটে না?" তদুত্তরে তিনি চটিয়া বলিলেন, "রেখে দাও তোমার মহাত্মা, আমি মহাত্মা নই। আমি এদের বন্ধু। এদের দেখবে না, তুলবে না, আর আমি এদের একটু ভালবাসি বলে তোমাদের চোখ টাটাবে, ছিঃ।"

পুরাতন বসুমতী প্রেসে ছাপাখানার ঘরে তিনি রাত্রে শুইয়া থাকিতেন। অনেক সময় পার্শ্ববর্তী কামরার লোকেরা তাঁহার ঘরে গভীর রাত্রে অকস্মাৎ ধরমার্ চিৎকার শুনিয়া উঠিয়া পড়িত। মহারাজ হাঁটু গাড়িয়া খাটিয়াতে বীরের মত বসিয়া রহিয়াছেন। চোখ দুটি যেন লাল করমচা, আপনমনে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন "চোপরাও শালা, ফের যদি মাথা তুলবে ত, তুমি আছ কি আমি আছি।" পার্শ্ববর্তী লোক বলিত, "আপনি ক্ষেপলেন নাকি, মহারাজ? এত গভীর রাত্রে কার সঙ্গে ঐ রকম ভয়ঙ্কর তুমুলভাবে তেওাই মেওাই করছেন?" তিনি নিরুত্তর, চুপ। ইহার অর্থ কে বুঝিবে।

পরিশিষ্ট

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আলমবাজার মঠে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজকে ভাল করে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়। বরাহনগর মঠের শেষভাগে গিয়েছিলাম ঠাকুরের পরম ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সঙ্গে। আমি তখন বালক, সুতরাং কারু সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। মণিবাবুকে মঠের সাধুরা খোকা বলে ডাকতেন। পূজ্যপাদ শশী মহারাজ মণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ ছেলেটি কে?" তিনি উত্তরে বল্লেন—"এরা আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকে, এটি আমার ভাই ফণীর সহপাঠী। ঠাকুরের ভক্ত।" তাঁর মুখেই লাটু মহারাজের প্রসঙ্গ শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তেরা নানা ফুলের গাঁথা মালা—এক একজন এক এক ভাবের মূর্তি, কিন্তু ঠাকুরের প্রেমসূত্রে একসঙ্গে গাঁথা। দেখ রামদাদা (মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত) একটি বেহারী বালককে বেহারা রেখেছিলেন—ঠাকুর তাঁকে লেটো বলে ডাকতেন। বাড়ীর কাজের চেয়ে ঠাকুরের কাছে রামদাদা তাকে পাঠাতেন জিনিসপত্তর মিষ্টিদ্রব্য দিয়ে। ঠাকুর দেখেই বুঝলেন তাঁর অন্তরঙ্গ। বালক বয়সে কয়েকদিন যেতে না যেতে ঠাকুরের কাছে থেকে গেলেন। তাঁর সেবা অদ্ভুত ছিল। মাঠাকরুণ আর

ঠাকুরের সেবাই তাঁর প্রধান কাজ ছিল—আবার এদিকে ধ্যান-জপ সাধন-ভজনে খুব নিষ্ঠা। ঠাকুরের তবুও অক্ষর-জ্ঞান ছিল—কিন্তু ইনি একেবারে নিরক্ষর।" এই কথা শুনে লাটু মহারাজের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। আমি যখন মঠে যেতাম—তখন তাঁকে গম্ভীর ধ্যানস্থ দেখতাম। আবার কোন কোন সময়ে দেখতাম তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁকে নিয়ে নানাবিধ রসকৌতুক করছেন—তাঁহার সরল স্বভাবই এইসব কৌতুকের কেন্দ্র ছিল।

একদিন আলমবাজার মঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সামনে দাঁড়ালাম—আমাকে বসতে আদেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় থাক—তোমার কে আছে, এখানে এলে কি করে?" পরে আমাকে বললেন, "পড়াশুনা মন দিয়ে করবে—দেখ না মঠের ভাইরা কত বিদ্বান—সর্বদা পাঠে ভজনে ব্যস্ত। নরেন্দ্র আমেরিকায় কি অদ্ভুত কাণ্ড করলেন! তাঁর লেখাপড়া পাণ্ডিত্য দেখে ওদেশের লোক অবাক। মন দিয়ে ত ভগবানকে ডাকতে হবে—সেই মন যদি পড়াশুনায় ছাত্রজীবনে না দিতে পার, তবে সেই চঞ্চল মনে ভগবানকে ডাকবে কি করে? এখানে মাঝে মাঝে সুবিধামত আসবে, আর রোজ ভোরে উঠে ভগবানের নাম করবে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরের কোণে কিংবা নির্জন স্থানে ঠাকুরের চিন্তা করবে। তা হলে

জীবনে সুখী হবে।" এইসব কথা বাংলায় বললেও হিন্দুস্থানী টান ছিল। অপর একদিন আলমবাজার মঠে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী যোগানন্দের মধ্যে ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনছি হলঘরে বসে। সামনে দক্ষিণদিকে সংলগ্ন বারান্দায় লাটু মহারাজ বসেছিলেন, এমন সময়ে রাজপথে একটা হরিনাম-সংকীর্তনের দল যাচ্ছিল। সেই শব্দ শুনে লাটু মহারাজ বাহ্যসংজ্ঞাহীন—ভাবস্থ। শরৎ মহারাজ লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "লাটুর ভাব হয়েছে—পড়ে না যায়।" উঁহারা উঠে এলেন—কিছু পরে হরিনাম করায় তাঁর বাহ্য-সংজ্ঞা ফিরে এল। তিনি "কুছ হয়নি" বলে তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে ছুটে গেলেন। আমি জীবনে সেই প্রথম ভাবস্থ হওয়া দেখলাম। মহারাজরা পূর্ববৎ প্রসঙ্গ করতে লাগলেন—এই সম্বন্ধে আলোচনা কিছুমাত্র হল না। বুঝলাম মঠে এইরূপ ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের প্রায়ই হয়ে থাকে, ইহা আলোচনার বিষয় নয় বা নূতন ঘটনা নয়।

একদিন বলরাম মন্দিরে দেখি লাটু মহারাজ হাতে লাঠি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন, আমি প্রণাম করিতেই বললেন, "চলো—আমার সঙ্গে বেড়াতে চল—ঠাকুরের ছোকরা ভক্তদের দেখতে পাবে—কেমন তারা সাধন-ভজন করছে। আমি তাঁর অনুসরণ করে ট্রামে উঠলাম—সাবেক কালের ট্রাম ঘোড়ায় টেনে নিত। তাঁর সঙ্গে যেখানে গেলাম সেখানে দেখি পূঃ কালীকৃষ্ণ মহারাজ, সুধীর মহারাজ, হরিপদ

মহারাজ প্রভৃতি আছেন। দোতলায় একটি ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি—সন্ধ্যারতি স্তবস্তুতি এবং পূঃ সুধীর মহারাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনলাম। উক্ত সমিতির সকলেই লাটু মহারাজকে সে রাত্রে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি বলরামবাবুর বাড়ী থেকে ; ও ছেলেমানুষ, বাড়ীতে বলে আসেনি। রাত্রিতে না গেলে ওকে তল্লাস করবে—ওর খোঁজ কেউ পাবে না। বলরাম-বাবুর বাড়ীর কেউ জানে না আমি এখানে এসেছি। ওকে আমি নিজে বাড়ীতে না পৌছে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। এই বিষয়ে তোমরা অনুরোধ করো না। আমি আবার যেদিন আসবো—সেদিন রাত্রিতে থাকবো।' আমার দিকে তাকিয়ে তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি একা যেতে পারবে না, সঙ্গে যদি কেউ যায় ?" আমার উত্তর দিবার পূর্বেই লাটু মহারাজ বললেন, "ওসব হবে না—ছেলেমানুষ তোমরা কালেজে পড়—ও স্কুলের ছাত্র—তোমাদের চেয়ে বয়সে ছোট। আমি দুর্ভাবনায় থাকবো।" তিনি এই বলে আমার হাত ধরে বাহির হলেন—উপস্থিত তরুণ ভক্তেরা তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর পদধূলি নিলেন। মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে তখন বাস করতাম। ট্রাম হাতিবাগানের মোড়ে স্টার থিয়েটারের সামনে দাঁড়ালে আমি বললাম, "মহারাজ এখান থেকে আমি যেতে পারবো

—আমার চেনা পথ।" তিনি বললেন, "ঠিক পারবে তো?" আমি বললাম, "এখান থেকে বেশ যেতে পারবো—আপনাকে নামতে হবে না।" তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আমি প্রণাম করে ট্রাম থেকে নামলাম। তিনি বললেন, "কাল বৈকালে এস।" আমি "যে আজ্ঞা" বলে বাড়ীতে ফিরে এলাম। আমার জন্য তাঁর ব্যস্ততা দেখে মনে মনে ভাবলাম এঁর কি ভালবাসা, ঠিক নিজের বাপের মত।

কি আলমবাজার মঠে, কি নীলাম্বরবাবুর বাড়ীর মঠে, কি বেলুড় মঠে দেখেছি লাটু মহারাজকে নিয়ে স্বামীজী, মহারাজ প্রভৃতি কি আনন্দ কৌতুক করতেন, আর লাটু মহারাজ কিরূপ সরল বালকের মত তাঁদের কথা শুনে বিশ্বাস করতেন। স্বামীজীর সাহেব মেম শিষ্য শিষ্যা দেখলেই তিনি প্রায় অন্যত্র সরে পড়তেন। স্বামীজী একদিন কৌতুক করে বললেন, "লাটু, ভাই তোকে এবার আমেরিকায় যেতে হবে। তারা অনেকে তোকে দেখতে চায়—ঠাকুরের আপন জন, প্রিয় শিষ্য বলে।" লাটু মহারাজ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "নরেন ভাই, আমি যাবে না—ওসব ম্লেচ্ছদেশ—আমার পোষাবে না।" স্বামীজী বললেন, "সে কি! ওরা ঠাকুরের ভক্ত—ঠাকুরের নামে এখন ওদেশ পুণ্যভূমি হয়ে গেছে, তোকে কত শ্রদ্ধা সমাদর করবে।" লাটু মহারাজ অমনি জোড়হাত করে বললেন, "না ভাই, আমি যাব না—আমি মুখ্যু মানুষ—কি জানি—ওদের সঙ্গে কথা

বলতে পারবো না।" এদিকে লাটু মহারাজ যত অনুনয় বিনয় করেন—স্বামীজীরা তত জিদ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।" শুনে লাটু মহারাজের বদন বিষণ্ণ হল—সকলেই তা দেখে হেসে উঠলেন। কিন্তু এটা যে তামাসা—তা তিনি বোঝেননি। তিনি মঠ থেকে কাউকে না বলে পালিয়ে বলরাম মন্দিরে গেলেন। এই রকম কত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছি। সাহেব মেমের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য স্বামীজী লাটু মহারাজকে কাশ্মীর-ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাস্তবিকই লাটু মহারাজ মঠ ও বলরাম মন্দিরে না থেকে প্রায় অন্যত্র বা কখনো বসুমতী অফিসে চলে যেতেন। তিনি পরে যখন বলরাম মন্দিরের নীচের ঘরে বাস করতেন—তখন তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ঠাকুরের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে—তাঁকে কেমন দেখেছেন?" তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দকে ত দেখেছ? কি দেখেছ?" আমি বললাম, "তিনি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে যেমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন—তাঁর কাছে গেলে, দর্শন করলে, তাঁর কথা শুনলে একটা অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি।" লাটু মহারাজের মুখমণ্ডলও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—বললেন, "খুব আনন্দময় পুরুষ ছিলেন—না? ঠাকুরকে মনে কর—ওঁর একশগুণ আনন্দময় পুরুষ! সে আনন্দের তুলনা

নেই !" এই বলে গম্ভীর হলেন—তাঁর দিকে চেয়ে দেখি—ধ্যানস্থ !

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিরক্ষর শিষ্যটিকে দেখলে মনে হত এঁর সাধনালব্ধ উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞানের কাছে বই শাস্ত্রাদি পাঠ করা জ্ঞান কত সংকীর্ণ—কত সীমাবদ্ধ—কত নগণ্য। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তিনি সামান্য সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করতেন। তাঁকে দর্শন করে কাছে বসে তাঁর উপদেশ শুনে মনে হত শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির প্রভাব কি অদ্ভুতভাবে অদ্ভুতানন্দের জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। একবার পাশ্চাত্ত্য পর্যটকের দল শুনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষর শিষ্য লাটু মহারাজের কথা। তারা কয়েকজন তাঁকে দর্শন করতে আর আলাপ আলোচনা করতে এসেছিল—সঙ্গে ছিল ইংরাজী-শিক্ষিত একটি ভক্ত। তারা এসে লাটু মহারাজকে সম্বোধন করে বলেছিল—"আমরা আপনার কাছে কোন ঈশ্বরীয় বিষয়ে উপদেশ শুনতে আসিনি—কারণ আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানি না।" লাটু মহারাজ তদুত্তরে বলেন—"তবে তোমরা কি মান ?" তাঁরা বললেন, "লোকের উপকার করাই আমরা মানবধর্মের উচ্চতম লক্ষ্য মনে করি—এই লক্ষ্য ঠিক করে জীবন পরিচালিত করা আমাদের আদর্শ।" লাটু মহারাজ সহাস্যে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা একটা কাজ করলে মনে কর এতে মানুষের খুব উপকার হবে—আর একদল মনে করছে তাদের কাজটা

করলে মানুষের বেশী উপকার হবে—তখন তোমাদের দু'দলে ঐ নিয়ে মতভেদ ঝগড়া বিবাদ দ্বেষাদ্বেষি হতে পারে। আবার তোমার দলের লোকেরা যদি তোমার নেতৃত্ব না মানে তখন তোমার জীবসেবা ঠিক চলবে কি? কত অভিমান—কত ক্রোধ কর্তৃত্বাভিমান দলের বিশৃঙ্খলতা কি বিঘ্ন ঘটাবে না? জগৎটা চেয়ে দেখ—ভাল কাজ ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কত বাদবিবাদ চলছে। যদি জীবের অন্তরে যে ভগবান রয়েছেন—তাঁর সেবা করছ—তাঁর সন্তান তোমরা এই মনে করে কাজ কর—তবে এই সব অন্তরায় হবে না।" সাহেবরা হেসে বললে, "আপনার ভগবান কি এত ছোট! আপনারা এদিকে বলেন, ভগবান—অনন্ত বিশ্বব্যাপী, আবার বলছেন মানুষের ভিতর তিনি রয়েছেন। আপনাদের ভগবান ত মজার ভগবান।" তাদের কথা শুনে লাটু মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন—"যুঁইফুল দেখেছ—তার পাপড়ি কত ছোট, আবার তার উপর শিশিরবিন্দু পড়ে দেখেছ। সেই অত ছোট শিশিরবিন্দুর ভিতরে উপরে অনন্ত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে—তা দেখেছ বোধ হয়। তেমনি ছোট বড় সব জন্তু মানুষের ভিতরে সেই অনন্ত সর্বশক্তিমান ভগবান প্রতিবিম্বিত হন।" পাশ্চাত্ত্য পর্যটকেরা লাটু মহারাজের এই উত্তর শুনে স্তব্ধ—হতবাক্। শ্রদ্ধাভরে তারা মস্তক অবনত করে বিস্মিত হৃদয়ে চলে গেল। তিনি যখন কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ শুনতেন—স্থানে স্থানে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলতেন,

"ঠিক বলেছ—আমি এই সব দেখেছি।"

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ একদিন আমাকে বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে কি কঠোর পরিশ্রম করে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করেছেন—স্বামীজীর দেহত্যাগের পর—কত বড় বড় মনীষী তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর কথা শেষ হলে আমি বলেছিলাম, "মহারাজ, আপনি বা স্বামীজী প্রতিভা-শালী বাগ্মী পণ্ডিত সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। ঠাকুরের কৃপায় আপনারা এই সব কাজ করবেন—সেটা আর আশ্চর্য কি! কিন্তু লাটু মহারাজ যিনি নিরক্ষর—যেমন গুরু তেমনি চেলা—একজন বাল্যে মেষপালক—কৈশোরে রামবাবুর বেহারা—তাঁর অপূর্ব জীবন ও কথা শুনলে মনে হয় ঠাকুরের অলৌকিক কৃপাশক্তির অদ্ভুত উজ্জ্বলতম উদাহরণ।" অভেদানন্দ স্বামী আমার কথা শুনে বিগলিত হৃদয়ে কোমল-কণ্ঠে বললেন, "ঠিক বলেছ, আমরা গুরুভাইরা সবাই মনে করি—লাটু মহারাজ ঠাকুরের miracle—তাঁর মত মহাপুরুষ জগতে খুব বিরল।"

বলরাম মন্দিরে নীচের ঘরে যখন লাটু মহারাজ থাকতেন —দেখতাম তাঁর অনুরক্ত ভক্ত ও সেবকদের প্রতি তাঁর কি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার! সেখানে ঠাকুরের ভক্তেরা—নবীন ও প্রাচীনেরাও—আসতেন। একজন যুবক ভক্ত এসে জানালেন, "সে চাকুরি ছেড়ে দিবে—ধ্যান-ভজন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে কাটাবে।" লাটু মহারাজ তার কথা শুনে

ভৎ´সনার স্বরে বললেন, "ভবঘুরে হয়ে বাপ-মার প্রতি যা কর্তব্য তাই ফাঁকি দিবে। বাপ-মা—তোমার বুড়ো পিতামহী রয়েছেন যিনি তোমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন—তাদের সেবা করাই তোমার ধর্ম। চাকরি ছেড়ে দিলে তাদের খাওয়াবে কে? ভগবানের উপর তোমার যে টান তা ত দেখতে পাচ্ছি। কতক্ষণ ধ্যান কর? দেখি নানা জায়গায় আড্ডা দিচ্ছ। জেন যারা মা-বাপের অন্নসংস্থান না করে ভবঘুরে ত্যাগীর ভান করে—তারা জীবনে কখনো একান্ত মনে ভগবানকে ডাকতে পারে না—ঘোর অশান্তিতে তাদের জীবন যায়। মা-বাপ ঠাকুর বলতেন প্রত্যক্ষ ভগবান। তাঁদের সেবা করে তুষ্ট রাখতে হয়, তাঁদের আশীর্বাদ অনুমতি ভিক্ষে করতে হয়—চলে গেলে তাঁদের যাতে খেতে কোনও অভাব না হয়—সেই সব যে ঠিকঠাক করে সাধন-ভজন করতে নির্জনে চলে যায়—সেই একান্ত মনে তাঁকে ডাকতে পারে! অমন কুবুদ্ধি এনো না—যখন ঠিক ঠিক বৈরাগ্য তোমার ভিতর আসবে—তখন ভগবানই সব সুযোগ সুরাহা করে দিবেন। জোর করে সাময়িক ভাবাবেগে কিছু করিস নি!" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "দেখ না বুড়ো বাপ-মাকে খাবার সংস্থান না করে সাধু হতে যাচ্ছেন। এর চেয়ে দুনিয়ায় পাপ নেই। সাধন-ভজন করতে বল—পাঁচ মিনিট বসেই ধ্যান-জপ শেষ—এদের আবার বৈরাগ্য! প্রাণভরে তাঁকে

একান্তে ডাকলে তিনিই সব ঠিক করে দেন।" কর্তব্য পালন করতে কারু ত্রুটি দেখলে লাটু মহারাজ তাহাকে তিরস্কার করে সদুপদেশ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন।

৺কাশীধামে যখন অদ্বৈতাশ্রমে ছিলেন—তখন তিনি সহজ সরল আনন্দময় সাধু। যখন কলকাতায় থাকতেন—তখন তাঁকে গিরিশবাবু ও কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে যেতে দেখেছি, তাঁরা লাটু মহারাজকে পরম সমাদরে প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ করতেন। কালীপদ ঘোষের নিকট একটি খালি বোতল নিয়ে যেতেন—সে বোতলে কালীপদবাবু তৈলপূর্ণ করতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে আদেশ করতেন এবং যাবার সময় কিছু আর্থিক ভিক্ষা দিতেন। কালীপদবাবুর মৃত্যু হলে তিনি দুঃখ করে আমার কাছে বলেছেন, "কত বড় ভক্ত কত নিরভিমান! কত গুপ্তদান ছিল—ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে তার হৃদয় পূর্ণ ছিল। আমাকে ভায়ের মত দেখতেন।" গিরিশবাবুর প্রসঙ্গে বলতেন, "ঠাকুর বলতেন সাক্ষাৎ ভৈরব। দেখেছ গিরিশবাবুর কথা শুনলে ভক্তিতে হৃদয় গলে যায়। এদের দেখলে পুণ্য হয়—কথা শুনলে জ্ঞান হয়—সঙ্গ করলে ভক্তি উদিত হয়।"

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। দেখেছি লাটু মহারাজের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি, লাটু মহারাজ তাঁর এই গুরুভাইকে খুব ভাল-বাসতেন। বসুমতীর আফিস বাড়ী তাঁর অনেক সময়

আশ্রয়স্থান ছিল। উপেনবাবুর ভাগিনেয়রা তাঁর অনুরক্ত সেবক ও ভক্ত ছিল। তাঁরাও লাটু মহারাজের আদেশ গুরুর আদেশ বলে যথাসাধ্য পালন করতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের আদর আবদার মহারাজও প্রসন্ন মনে সহ্য করতেন। ৺কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমের পরে যখন পৃথক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লাটু মহারাজ বাস করিতেন—তখন উপেনবাবু তাঁহার বিশেষ সংবাদ নিতেন।

৺কাশীধামে কয়েকবার লাটু মহারাজকে দর্শন করতে গিয়েছি। তাঁর কৃপাপূর্ণ সপ্রেম ব্যবহার ভুলবার নয়। বাস্তবিক তখন আচার্যের মত কয়েকজন সেবক ভক্তের সাধন-ভজন ও আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে সহায়তা করতেন। জিজ্ঞাসু ভক্তকে প্রশ্নের উত্তর দিতেন, সরল সোজা কথায় উপদেশ দিতেন। তাঁকে দর্শন করলেই মনে হত যে একজন দিব্যানন্দে বিভোর সরল বালভাবাপন্ন মহাপুরুষ। ৺কাশীধামে তিনি আমাকে বললেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, কাশী স্বর্ণময় পুরী—বিশ্বনাথ জীবকে মহামন্ত্র দিয়ে উদ্ধার করছেন। কত কৃপা! গুরু—শিবগুরু—অপার কৃপা। মা অন্নপূর্ণা সবাইকে অন্ন দিচ্ছেন—শুধু ক্ষুধার অন্ন নয়—আত্মার আহারও অকাতরে দিচ্ছেন। ভগবান অবতার হয়ে, মানুষ হয়ে এসে জগৎকে এই রকম কৃপা করেন। এইটি মনে ধারণা করবে এই কাশীধামে।"

লাটু মহারাজ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—যেন গভীর

ভাবসমুদ্রে ডুবে গেছেন। প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন বেশ স্নেহপূর্ণ স্বরে, "৺কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমে আছ—মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করো।" তাঁর অফুরন্ত অহেতুকী কৃপার কথা যখন মনে হয়, তখন তাঁর সহাস্যবদন দিব্যমূর্তি মনে উদিত হয়। 'কথামৃতে'র দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, "চতুর্দিক নীরব। রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন।'

"আজ পূর্ণিমা। চতুর্দিকে বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো কাটিয়া পড়িতেছে।

"আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন, পঞ্চবটীমধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনিই নির্জনে একাকী ডাকিতেছিলেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন'। মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন।"

এই তিনিই শ্রীম, রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া তিনি এই দৃশ্য দেখেছিলেন। এই ভক্তটি—স্বয়ং লাটু মহারাজ—ব্যাকুলভাবে ভগবানের জন্য তাঁর আর্তনাদ। স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীম'র নিকট অনেক দিন একসঙ্গে বাস করেছিলেন। তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন যে, মাষ্টার মশায় তাঁকে

বলেছিলেন—লাটু মহারাজ আর্তনাদ করে পঞ্চবটীতে বসে 'দাদা মধুসূদন' বলে আর্তনাদ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "লেটো তো দিনরাত চোড়েই রয়েছে।"

জয় ঠাকুর—জয় মা—জয় লাটু মহারাজ।

পূর্ববঙ্গে মহাপুরুষ নাগমহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া শ্রীলাটু মহারাজ একদিন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিলেন, "বেদ-বেদান্ত পড়বার ঢের সময় পাবেন, কিন্তু নাগমহাশয় পৃথিবী হোতে চ'লে গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো সাক্ষাৎ পাবেন না, এ সময়ে তাঁর সেবা করার সুযোগ ছাড়বেন না।" শ্রীলাটু মহারাজের এই প্রেরণাতেই শরৎচন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভোগে যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থায় তাঁর অনেক সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে প্রথমবার ভারতে ফিরিবার পর শ্রীলাটু মহারাজ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সবকথা স্মরণ করিয়া শ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন, "অমন গুরুভাই কি আর হয়! কত যত্ন কোরে আমায় নিয়ে গিয়ে সব জায়গা দেখালে যাতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়! স্বামীজীর তো আপন দুই ভাই আছে, তাদের কখনো তিনি এত যত্ন

করেন নাই। গুরুভাই সহোদর ভাই-এর চেয়ে খুব আপনার হয়।"

একদিন লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "তোদের হাতে টাকা নেই বেঁচে গেলি। টাকা থাকলে প্রায়ই বদ মতলব আসে। টাকাকড়ি থাকবে অথচ সৎবুদ্ধি হ'বে—এ ঠাকুরের বিশেষ দয়া।"

কাশীতে হাড়ারবাগে মহারাজ থাকতেন। ওই বাড়ীর নীচের তলায় শিব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমাকে রোজ ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করতে বলতেন।

আর একদিন বলেছিলেন, "কাশীবাস করে শিব দর্শন করা দরকার। আমার ইচ্ছা হয় রোজই শিব দর্শন করি, কিন্তু শরীরে সহ্য হয় না। তোরা আমার নকল করিস নি।"

লাটু মহারাজ মেয়েদের বেশী ঘোরা ফিরা করিতে নিষেধ করিতেন। স্বামি-সেবার উপর খুব জোর দিতেন। লাটু মহারাজ বলতেন—"মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন।" মহারাজ একদিন কথার ছলে রামেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হ্যাঁরে, তোর বউ কেমন রে?" রামেশ্বরবাবু বলেন—"সে লোক খুবই ভাল। তবে তার ধর্মে জ্ঞান নেই বলে মনে হয়।" লাটু মহারাজ ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরই কি ধর্মজ্ঞান হয়েছে? ও যা করবার করে গিয়েছে। তুই তোর কাজ করে নিগে যা।"

রামেশ্বরবাবুর স্ত্রী অতিশয় পতি-ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লাটু মহারাজ তাহা জানিতেন। সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামেশ্বরবাবুর স্ত্রী সজ্ঞানে তাঁহার স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়াই দেহত্যাগ করেন।

লাটু মহারাজের নিকট ভগবৎবিষয়ক কথা ব্যতীত অন্য কথা হইবার উপায় ছিল না। জনৈক ভক্ত একদিন কোন বৈষয়িক কথা উত্থাপন করিলে লাটু মহারাজ অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আরম্ভ হইলে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন।

একদিন সকাল সাড়ে সাতটায় মহারাজ ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহার কোনও খেয়াল হয় নাই। প্রায় আড়াইটার সময় জনৈক সেবক তাঁহাকে বলিলেন যে, ভক্তগণের এখনও আহারাদি হয় নাই। ইহাতে মহারাজের খেয়াল হইল।

লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা পছন্দ করিতেন না। কেহ নীচ হইতে কড়া নাড়িলে যদি তিনি বুঝিতেন যে, স্ত্রীলোক আসিয়াছে তাহা হইলে বিশেষ ভক্তিমতী না হইলে উপরে আসিতে দিতেন না। যাহারা

বিশেষ ভক্তিমতী মহারাজ তাহাদের রাঁধা দ্রব্যও গ্রহণ করিতেন।

কাশীধামে হাড়ারবাগে অবস্থানকালে লাটু মহারাজকে একটি অল্পবয়স্কা গয়লানী দুধ দিয়া যাইত। একদিন সন্ধ্যাকালে জনৈক ভক্ত উক্ত গয়লানীর সহিত রহস্য করিতেছে জানিতে পারিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করেন। মহারাজের আদেশে সেইদিন হইতে তাহার দুধ বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি লেখককে সেবাশ্রম হইতে দুধ লইয়া আসিতে আদেশ করেন। যিনি সন্ধ্যাবেলায় মেয়েটির সহিত গল্প করিতে-ছিলেন, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন—সন্ধ্যাবেলায় সাধুর কাছে এসেছ কোথায় একটু ঈশ্বর চিন্তা করবে, তা না করে ঐ ছুঁড়িটার সাথে ফচকেমি করছো।

একবার জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে চিঠি লেখেন যে, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না। লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— না, না, কখনই না। মেয়ের সংস্কার নষ্ট করে দিতে লিখে দে। সংস্কার নষ্ট হয়ে যাবার পর মেয়েরা বাপের বাড়ীতে থাকতে পারে। তিনি একদিন বলেছিলেন, ওরে বাপ-মার সেবা হাজার টাকা থাকলেও ছেলেরা করে না। মেয়েরাই করে। তাই মেয়েদের বিয়ের পর সংস্কার নষ্ট হয়ে গেলে সে তার বাপ-মার কাছে থাকলে

তাদের ভালই হয়।

লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিলেন—আবার কি চাও? ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গ পেলে, তাঁদের সকলের ভালবাসা পেলে। তোমার ভিতর কি আছে তাঁরাই জানেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু। যে ভবরোগ থেকে উদ্ধার করতে পারে সে জ্বর সারিয়ে দিতে পারে না? তোমার কাছে বিশ্বনাথ পাথর। শঙ্করাচার্যের জন্য দেহধারণ করে বলেছিলেন—"তুমি আমার কাজ কর।" ৺কাশীতে এসেছ, ৺বিশ্বনাথের পূজা করতে হয়—তুমি যা ভালবাস তাই তাঁকে দিতে হয়। জনৈক ভক্ত ফুল বেলপাতা মিষ্টি দিয়া ৺বিশ্বনাথের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ আনিয়া দেওয়া মাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'বহু ভাগ্য—বহু ভাগ্য।' জন্ম-জন্মান্তরে—এই পর্যন্ত বলিয়া চাপিয়া গেলেন। জনৈক ভক্তকে জাত্যভিমানবশতঃ অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন—প্রসাদে দ্বিধা করতে দেব না। জনৈক সাধুর উক্তি—'আহার্য বস্তুর প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত, শুনিয়া বলিয়া-ছিলেন—এর জন্য ভগবানকে দিক্ করা কেন? তিনি পিতা, চাইলে তিনি ত দেবেনই। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজলপান করলে প্রথম প্রথম সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে। তারপর যখন স্থূলভাবে কাজ করে তখন জানতে পারা যায়।

মা গঙ্গা কি পবিত্র! গঙ্গাস্নানের পর দশ মিনিট বসলে

মন স্থির হয়ে যায়।

জনৈক ভক্ত একদিন লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করেন—মহারাজ, বার বছর সত্য বললে নাকি সত্যবাক্ হয়ে যায়? সে তখন যা বলে তাই নাকি সত্য হয়? সে যদি অসম্ভব কিছু বলে তবে তাও কি সম্ভব ও সত্য হবে? লাটু মহারাজ ভক্তটির কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—যারা বার বছর সত্য কথা বলেছে, তারা সত্য চিন্তাও করেছে জানবে। তা না হলে সে বার বছর সত্য কথা বলতে পারে না। অসম্ভব কথা বলা ত দূরের কথা, তারা তা ভাবতেও পারে না। তারা সত্যই বলে, অসম্ভব কিছু বলে না। বার বছর সত্য কথা বলে বলে তাদের nerves (স্নায়ুগুলি) সংযত হয়ে যায়। পরে তারা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু বলতে পারে না।

একদিন জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে ঠাকুরের একটি ছবি আনিয়া দেখান। ছবিতে ঠাকুর বসিয়া আছেন এবং জগন্মাতা কালী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। ঠাকুরের ঐরূপ ছবি ভক্তটি বাজারে দেখিয়াছেন। ঠাকুরের ঐরূপ ছবি দেখিয়া ভক্তটি মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ একটি আনয়ন করেন। লাটু মহারাজ ঐ ছবিটি দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং বারংবার বলিতে থাকেন—ও শিল্পী ঠাকুরকে কি ঐভাবে দেখেছে? এখনি নিয়ে যাও ঐ ছবি আমার সামনে থেকে। মহারাজের

কথায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

*　　*　　*

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজ সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিতেন—"ওরে তোদের লাটু মহারাজ অহেতুক পতিতপাবন।" অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া তাঁহার কাছে আসিলে তিনি অভয় ও আশ্রয় দান করিতেন এবং বলিতেন, "দোষগুণ মানুষের আছেই; দোষ দেখতে নাই গুণই দেখতে হয়।"

শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতেন, "লাটুর মেজাজ সপ্তমে চড়তে যতক্ষণ, নাবতেও ততক্ষণ।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "লাটু খুব পবিত্র, এদিক ওদিক (অপবিত্র ভাব) একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। ঠাকুরের কথা খুব মেনে চল্‌তো।"

লাটু মহারাজের গুরুভাইদের ও ভক্তদের প্রতি অগাধ প্রীতি ছিল। একবার স্টার থিয়েটারে পূজনীয় শরৎ মহারাজ বক্তৃতা দিতেছিলেন। অনেকক্ষণ বক্তৃতার পর লাটু মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, শরৎ মহারাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। লাটু মহারাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"শরৎ ঢের হয়েছে, থাম; আর বক্তৃতা দিতে হবে না।" গুরুভ্রাতার মুখে ঐ কথা শুনিয়াই শরৎ মহারাজ বসিয়া পড়িলেন। জনৈক শ্রোতা ঐ ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া লাটু মহারাজকে কটু কথা বলিতে আরম্ভ

করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "খুব দরদ তো দেখাচ্ছ, কাল যদি শরতের শরীর অসুস্থ হয় তখন তুমি কি করবে ? তুমি বাড়ী যাবে, সব ভুলে যাবে—যে কে সেই।"

আমার একবার শরৎ মহারাজকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়। লাটু মহারাজের নিকট সেই কথার উল্লেখ করিলে তিনি বলেন, "খুব ভাল কথা। তবে ভয় হয়, পাছে ওর অসুখ করে। ওর দ্বারা কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।"

শরৎ মহারাজ লাটু মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া কোন সাধু জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?" শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, "লাটু আমাদের আগে ঠাকুরের কাছে এসেছে। আমরা যখনই ঠাকুরের কাছে আসতাম, লাটু আমাদের কত যত্ন করতো ; আলো দেখিয়ে রাস্তায় এগিয়ে দিতো।" লাটু মহারাজের দেখিয়াছি শরৎ মহারাজের উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আগে বুঝতে পারিনি, তাই কত কথা বলেছি। এখন দেখছি শরৎ না হলে মায়ের সেবা কেউ করতে পারতো না। শ্রীশ্রীমহারাজও এত হাঙ্গামা পোয়াতে পারতেন না।" চিঠিতে শরৎ মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "যত দিন যাচ্ছে, ঠাকুরের ও তোমাদের মহিমা ক্রমশঃ বুঝতে পাচ্ছি।" শেষবার ৺কাশীতে যখন শরৎ মহারাজ দেখা করিতে

আসেন, লাটু মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন